দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ১১ নভেম্বর ২০১৯।। ২৪ কার্তিক - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

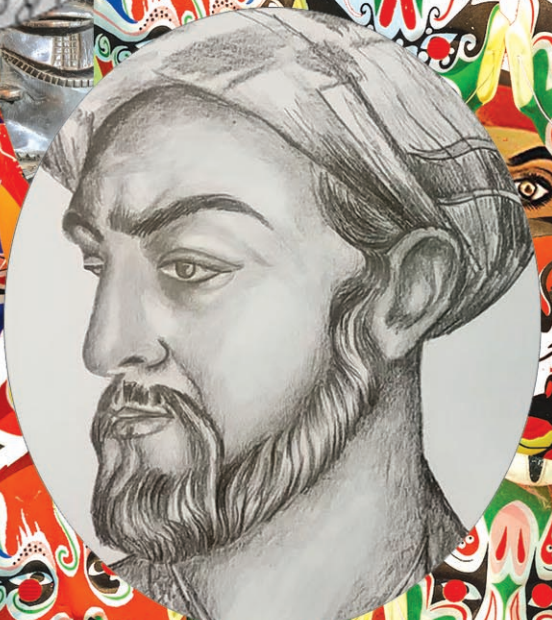

মুখোশের আড়ালে

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২৪ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১১ নভেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

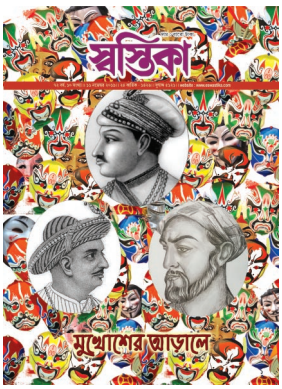

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

পশ্চিমবঙ্গে আজ জাতিদাঙ্গার পরিস্থিতি □ বিশ্বামিত্র □ ৬

এরাজ্যে বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার
□ ধীরেন দেবনাথ □ ৭

এবার কাশ্মীরি জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফেরার সময়
□ নলিন মেহতা □ ৮

ভারতের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি একটি সময়ের দাবি
□ ড. সুদীপ ঘোষ □ ১১

টিপু সুলতান দেশপ্রেমিক নন মোটেই
□ পারুল মণ্ডল সিংহ □ ১৩

সিরাজ-উদ্-দৌলা কি প্রকৃতই বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৫

বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও উপদেষ্টার মন্তব্য দুদেশের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে □ ২৩

বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত বলা সত্যের অপলাপ মাত্র
□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ২৪

পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক শাসকের
□ ডা: আর এন দাস □ ২৬

অর্জুনের রথ □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ৩১

রুদ্রাম্মাদেবী ভারতের এক অনন্যা বীরাঙ্গনা
□ কৌশিক রায় □ ৩২

মৃদঙ্গ □ চূড়ামণি হাটি □ ৩৩

গল্প : শহরের রূপকথা □ মালিনী চট্টোপাধ্যায় □ ৩৫

গল্প : দুজন দলছুট □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৩৭

জেহাদি তিতুমিরকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানানোর কৃতিত্ব বাম-ইসলামিক ইতিহাসবিদদের □ অভিমন্যু গুহ □ ৪৩

বল্লভভাই প্যাটেল অবহেলিত দেশনায়ক
□ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৫

বিচলিত প্রজ্ঞাবানের চিন্তার পৃথুলতা
□ কুণাল চট্টোপাধ্যায় □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯** **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৮ নভেম্বর
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৮ নভেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং হিন্দু বাঙ্গালি

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে জোর তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূল এবং বাম শিবিরের দাবি পঞ্জীকরণ হলে যারা বাংলাদেশ থেকে এই বঙ্গে এসেছেন, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে আবার তাড়ানো হবে। এই নিয়ে গ্রামে গ্রামে চলছে জোর প্রচার। অথচ নাগরিক পঞ্জীকরণের পরিপূরক নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছেন না। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং হিন্দু বাঙ্গালি। নাগরিক পঞ্জীকরণ হলে হিন্দু বাঙ্গালির আদৌ কোনও ভয় আছে কিনা এবং যেসব হিন্দু এখনও ভারতীয় নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মাধ্যমে তারা কীভাবে উপকৃত হবেন— থাকবে এই নিয়ে কয়েকটি বিশেষ রচনা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সত্য প্রকাশিত হউক

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার উপর জোর দিয়াছিলেন। নিবেদিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যতক্ষণ না ভারতবাসী দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হইতেছে, ততদিন নিজেদের সমৃদ্ধিশালী অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তাহারা সচেতন হইবে না। তাহাদের অন্তরে প্রকৃত দেশপ্রেমের উন্মেষও ঘটিবে না। নিবেদিতা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে পরাধীন ভারতে সুচতুর ব্রিটিশ শাসকরা সুকৌশলে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করিতেছে। এই বিকৃত ইতিহাসকেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষে এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করা যাহারা নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল এবং সচেতন না হইয়া পাশ্চাত্যের শিখানো বুলি কপচাইতে অভ্যস্ত হইবে। এই কার্যে ব্রিটিশ সফল হইয়াছে এই কথা অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ মেকলে সাহেব যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন—তাহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতবাসীকে ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পরও দেশের প্রকৃত ইতিহাস দেশবাসীকে জানাইবার কোনো উদ্যোগই নেয় নাই। বরং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসও মেকলের নীতিকেই শিরোধার্য করিয়াছিল। উপরন্তু, দেশবাসীকে প্রকৃত ইতিহাস ভুলাইয়া রাখিবার পশ্চাতে কংগ্রেসের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দলে যতই পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ততই চেষ্টা হইয়াছে নেহরু-গান্ধী পরিবারকে মহিমান্বিত করিয়া তোলার। এই কাজে বামপন্থীরাও অনেকটাই সহায়ক হইয়াছে কংগ্রেসের। কংগ্রেসি এবং বামপন্থী ঐতিহাসিকদের সৌজন্যে পূর্ববর্তী কংগ্রেস এবং বাম সমর্পিত অকংগ্রেসি সরকারগুলি সেই ইতিহাস রচনাতেই সহযোগিতা করিয়াছে যে, ইতিহাস দেশের প্রকৃত বীর সন্তানদের অন্তরালে রাখিয়া, কখনো বা তাহাদের চরিত্র হনন করিয়া সেইসব চরিত্রকেই প্রচারের আলোয় আনিবে, যাহাতে নেহরু-গান্ধী পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়।

ইহার ফলশ্রুতি হইয়াছে মারাত্মক। বিগত সাতটি দশক ধরিয়া দেশবাসীর সামনে সেই ইতিহাসই উপস্থাপিত হইতেছে, যে ইতিহাস ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নহে। এমন ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে, যে ইতিহাসে আক্রমণকারী বিদেশি মুসলমান শাসকদের মহানুভব রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। আড়াল করা হইয়াছে তাহাদের শাসনকালে ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর নিপীড়নের ঘটনাগুলি। টিপু সুলতানের মতো হিন্দু বিদ্বেষী অত্যাচারী শাসককে স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বখতিয়ার খিলজির দ্বারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসকে গুরুত্বহীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আক্রমণকারী মুঘল বাদশাহ অওরঙ্গজেবকে ধর্মপ্রাণ, দানশীল সম্রাট হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। অত্যাচারী বিধর্মী শাসক সিরাজদৌল্লাকে অযথা বীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে। অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বাঙ্গলার বিপ্লববাদী আন্দোলনের গুরুত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম যে প্রকৃত অর্থেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সত্যটিই এই বামপন্থী এবং কংগ্রেসি ঐতিহাসিকরা অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাত দশক ধরিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাসটি দেশবাসীকে জানিতে না দিবার ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের অতীত গৌরব সম্পর্কে সচেতন হয় নাই।

কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে, দেশের প্রকৃত ইতিহাসটি রচনা করিবার। দেশের তরুণ প্রজন্মকে যদি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতেই হয়, তবে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস অবিলম্বে রচনা করা প্রয়োজন। এই কার্যে আর বিলম্ব করা সমীচীন হইবে না।

সুভাষিতম্

যোজনানাং সহস্রাণি বর্ত্ম যান্তি পিপীলিকাঃ।

অগচ্ছন্ বৈনতেয়োঽপি পাদমেকং ন গচ্ছতি।। (চাণক্য নীতি)

গমনশীল পিপীলিকাও সহস্রযোজন অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু চলতে শুরু না করলে গরুড়পক্ষীও এক পা অগ্রসর হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে আজ জাতিদাঙ্গার পরিস্থিতি

আদালতের নির্দেশ সকলেরই মান্য করে চলা উচিত। পুলিশ প্রশাসনেরও দায়িত্ব আছে। পাশাপাশি মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে যাতে আঘাত না লাগে, তা দেখার দায়িত্ব যেমন প্রসাসনের, আদালতের ওপরও সেই দায়িত্ব বর্তায় বই কী! ছট পুজোর দিনে রবীন্দ্র সরোবরের তালা ভেঙে পুণ্যার্থীরা তাঁদের ধর্মীয় রীতি পালন করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা আদালতের নির্দেশ জানতেন কী জানতেন না, তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন এঁদের সজাগ করার দায়িত্ব তো প্রশাসনের, তাঁরা কী করছিলেন? সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার, রীতির কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনের উদারতা হিন্দু সমাজের আছে। দুর্গাপুজোতেও এখন গঙ্গায় কেবল প্রতিমাই নিরঞ্জন হয়, পুজোর উপকরণ ডাঙ্গায় ফেলা হয়। হিন্দুধর্মে পরিবেশ-ভাবনা ও সচেতনতার নজির আছে। তাই জলদূষণ এড়াতে ডাঙ্গাতেই কুশ ফেলা রীতি, জলে নয়। আসলে এসব নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে রাজনীতির।

সোশ্যাল মিডিয়ায় টুকরো টুকরো মন্তব্য শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ একে পরিবেশের ধর্ষণ বলে তুলনা টানছেন, আবার 'পক্ষ'রা বলছে বিহারিদের বাঙ্গলা থেকে তাড়াতে হবে। কেউ বা এতে বিজেপির চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে। আবার আরেকদল 'বিজ্ঞান'-এর নামে ধুয়ো তুলছে সূর্য পুজোটুজো আবার কী! বন্ধ করো এসব। ফলে এখন যে পরিস্থিতির দিকে পশ্চিমবঙ্গ চলেছে তাতে ভাষাভিত্তিক জাতিদাঙ্গা অচিরেই বাঁধবে এবং তা রুখতে না পারলে সর্বনাশ অনিবার্য। স্বাধীনতার পর থেকে একটা ব্যাপার ভারতীয়দের গা সওয়া হয়ে গেছে। নানা ভাবে, জাতপাতকে ভিত্তি করে হিন্দু সমাজকে টুকরো করা এবং এই বিভাজন নীতি নিয়ে (যাকে পরিভাষায়) 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি বলা যায়) মনের সুখে ভারতভূমিতে লুঠপাঠ করো, বৈদেশিক শক্তির ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করো। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ষড়যন্ত্রীদের অস্ত্র ভোঁতা হয়েছে, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে জনজাতি মানুষকে একত্রিত করে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাত-বর্ণের সমাহারে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজের ছবিটা তুলে ধরার কাজটা করে চলেছে, রাজনৈতিক বিরোধিতা তাঁদের কঠোর সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিলেও পিছুপা তাঁরা হননি।

বিশ্বামিত্র-র কলম

মোদী-অমিত শাহের নেতৃত্বে অন্তত রাজনৈতিক উত্থান সমগ্র হিন্দু সমাজ দেখিয়েছিল বহু মুসলমান তাঁদের আরব-সম্ভূত 'ধর্মীয়' পরিচয়কে আস্তাকুঁড়ে ফেলে, উপাসনা-পদ্ধতির স্বতন্ত্রতা উপেক্ষা করে বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল— খণ্ডিত নয় এক ঐক্যবদ্ধ চেহারার ভারত প্রকাশ পেয়েছে। এক দেশ, এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান--- অতীতের গৌরবশালী ভারতবর্ষ আবার বর্তমান সময়ে এক জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের উপক্রম করেছে, আরবীয় সংস্কৃতির দালালরা তারা যে দলভুক্তই হোন না কেন, তৃণমূল কিংবা সিপিএম বা কংগ্রেস, এর ফলে তারা জ্বলবেই। তাই জাতপাতের খেলা বন্ধ হতে এখন ভাষাভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজনের নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে।

> **বাঙ্গালি হিন্দুকে তাদের স্বার্থ উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে হিন্দুদের কী শোচনীয় পরিস্থিতি তা খেয়াল রাখতে হবে। '৪৭-এ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, বাঙ্গালি হিন্দুদের মান বেঁচেছিল, আজ এই পরিস্থিতিতে তাঁর অভাব পূরণ করার দায়িত্বভার নিতে হবে। তাই সচেতনতা আপনা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। নইলে বিপদ কিন্তু দরজায় কড়া নাড়ছে।**

এই বিভাজন নতুন নয়। স্বাধীনতার পর যেমন জাতপাতকে কেন্দ্র করে বিভাজনের রাজনীতি হয়েছিল। এবার বিভাজনের নতুন অস্ত্র প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতার ইন্ধন স্বাধীনতার পরও দেশবাসী দেখেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে প্রাদেশিকতার ইন্ধন চলছে তাতে বৃহত্তর বাংলাদেশের ষড়যন্ত্র চলছে। '৪৭-এ দেশভাগের সময় অখণ্ড বঙ্গের ধুয়ো তুলেছিল ইসলামিক সাম্প্রদায়িকরা, তাতে যোগ দিয়েছিল বিপথ চালিত কিছু হিন্দু-নেতা ও বলা বাহুল্য কমিউনিস্টরা। আজ আবার সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছট পুজাকে কেন্দ্র করে বিহারি খেদাও অর্থাৎ বিহারের মানুষকে এরাজ্য থেকে তাড়ানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দুদের বোঝানো হচ্ছে মুসলমানরাই তাদের প্রকৃত বন্ধু, তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম। যে সম্প্রদায়টি আসলে পরধর্মবিদ্বেষী, পরমত অসহিষ্ণু, ভিন্ন ধর্মের মানুষকে যারা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে কাফের বলে ডাকে তাদের ভ্রাতৃচেতনা মুসলমানের মুরগি বাৎসল্যের সমান।

তাই বাঙ্গালি হিন্দুকে তাদের স্বার্থ উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে হিন্দুদের কী শোচনীয় পরিস্থিতি তা খেয়াল রাখতে হবে। '৪৭-এ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, বাঙ্গালি হিন্দুদের মান বেঁচেছিল, আজ এই পরিস্থিতিতে তাঁর অভাব পূরণ করার দায়িত্বভার নিতে হবে। তাই সচেতনতা আপনা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। নইলে বিপদ কিন্তু দরজায় কড়া নাড়ছে। ▮

এরাজ্যে বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার

ধীরেন দেবনাথ

'আধার কার্ড'-এর সঙ্গে 'প্যান', 'ভোটার' ও 'রেশন' কার্ডের সংযুক্তিকরণ এবং ওইসব কার্ডে নিজেদের নাম-ঠিকানা সংশোধন বা শুদ্ধিকরণের যে অভিযান চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তাকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যে জনমনে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল বিভ্রান্ত ও ভীতি। রেলে, বাসে, হাটে, বাজারে সর্বত্র একটাই কথা— অসমের মতো এরাজ্যেও হচ্ছে 'এন আর সি' বা নাগরিকপঞ্জি। তাদের বক্তব্য, এন আর সি হলে পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের এদেশ থেকে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। নয়তো তাদের ঠাঁই হবে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে', যা এক মূর্তিমান নরককুণ্ড। আর এই মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়া প্রচার বা প্ররোচনা দ্বারা মানুষ হচ্ছে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত। এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন শিক্ষিত মানুষ, তেমনি রয়েছেন সাধারণ মানুষও। আশ্চর্যের এটাই যে, শিক্ষিত ও সচেতন মানুষদের আচরণও সাধারণ মানুষদের মতো। তাঁরাও বিভ্রান্ত, ভীত ও উদ্বিগ্ন। চোখেমুখে তাঁদেরও অসহায়তার ছায়া। তাঁদেরও জিজ্ঞাসা, তাঁদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে না তো? তাঁদের জেলে পোরা হবে না তো? আরও কত কী! এক্ষেত্রে শিক্ষিত- অশিক্ষিত নির্বিশেষে অস্তিত্বের সংকটে ভোগা উদ্বাস্তু বাঙ্গালিরা এসে দাঁড়িয়েছেন এক সারিতে। সবাই বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা নেই। আসলে এঁরা যে 'ঘরপোড়া গোরু', তাই সিঁদুরে মেঘকে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। কারণ জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব (হিন্দু-মুসলমান এক জাতি নয়)-এর ভিত্তিতে ভারত ভাগের শিকার হয়েছেন পাকিস্তান বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি হিন্দুরা। পাকিস্তান ইসলামিক দেশ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা হন 'কাফের' (বিধর্মী) প্রতিপন্ন। আর সেই অপরাধে উগ্র হিন্দু বিদ্বেষী জেহাদি মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দুরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় জন্মভূমি ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে এসে ঠাঁই নিতে হন বাধ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হলেও হিন্দু নির্যাতন সমানে চলতে থাকায় বাংলাদেশ থেকেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে আসতে বাধ্য হন। তাই পূর্বপাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হিন্দুরা এদেশে আশ্রয় নিয়ে যখন একটু গুছিয়ে বসেছেন তখন এন আর সি-র নামে আবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার আতঙ্কে তাঁরা যে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হবেন তা তো স্বাভাবিকই। এমনিতেই উদ্বাস্তু বা হিন্দু শরণার্থীরা অসমের এন আর সি-র ঘটনায় ও রটনায় ভীতসন্ত্রস্ত। কারণ একটা মানুষ ক'বার উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা হতে পারে? তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ কাউকে ফেরত নেবে না। এহেন পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের মনে একটাই প্রশ্ন, তবে কী তাদের ঠাঁই হবে জেলে? তাই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা অযৌক্তিক নয়।

তবে এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির জন্য একমাত্র দায়ী মুসলমান তোষণকারী, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী বাম-সেকুলার দলগুলি। এমনিতেই বামেরা এ রাজ্যে বিলুপ্তির পথে। আর কংগ্রেস এখন সাইনবোর্ড সর্বস্ব দল। পক্ষান্তরে, শাসক তৃণমূলের শুরু হয়েছে 'অন্তর্জলি যাত্রা'। তাই তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বিগত নির্বাচনে হারানো উদ্বাস্তু ভোট ফিরে পেতে রাজ্যের সর্বত্র গোপনে চালাচ্ছে অপপ্রচার যে, মোদী সরকার এরাজ্যেও অসমের মতো এন আর সি চালু করে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের তাড়াবে, নয়তো জেলে পুরবে। কেন্দ্র বিরোধী এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমও সেই অপপ্রচারের সুরে ধরেছে পোঁ। স্বভাবতই অপপ্রচারের আগুন ছড়িয়েছে জনারণ্যে। গোয়েবলসীয় মিথ্যে প্রচার 'ভাইরাল' হতেও সময় লাগেনি। বহু মানুষ ওই অপপ্রচারের শিকারও হয়েছেন। অনেকেই বলছেন, 'বিজেপিকে ভোট দিয়ে ভুল করেছি, আর নয়। তাঁরা যে ওই অপপ্রচারের শিকার তা বলাই বাহুল্য। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বিজেপির নেতা-কর্মীরাও ওই অপপ্রচারের মোক্ষম জবাব দিতে বড্ড দেরি করেছেন। অবশ্য দেরিতে হলেও কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্ব অবস্থা বেগতিক বুঝেই সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন— হিন্দুদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একজন হিন্দুকেও দেশ থেকে তাড়ানো হবে না। সবাই নাগরিকত্ব পাবেন।

'আধার কার্ড'-এর সঙ্গে অন্যান্য কার্ডের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সরকার চাইছে একটি মাত্র আসল পরিচয়পত্র তৈরি করাতে, যাতে ভুয়ো ও একাধিক পরিচয়পত্র বাতিল হয়।

সত্যি বলতে কী, 'আধার কার্ড'-এর সঙ্গে অন্যান্য কার্ডের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সরকার চাইছে একটি মাত্র আসল পরিচয়পত্র তৈরি করাতে, যাতে ভুয়ো ও একাধিক পরিচয়পত্র বাতিল হয়। এমনকী তার লক্ষ্য, নাম-ঠিকানার ভুলভ্রান্তি সংশোধন পূর্বক নির্ভুল পরিচয়পত্র নির্মিত হোক, যা জনগণনায় সাহায্য করতে পারে। তার সঙ্গে এন আর সি-র কোনো সম্পর্ক নেই। যা কেবল অপপ্রচার এবং সবই রাজনৈতিক। তাই সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। ■

এবার কাশ্মীরি জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফেরার সময়

অতিথি কলম

নলিন মেহতা

কেউ বিষয়টার সঙ্গে একমত হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ থেকে ২৩ জন সাংসদের কাশ্মীর সফর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে টেনে এনেছে। কিছুটা মতবিরোধ এই নিয়ে চলছে যে এই প্রচেষ্টাটি কি কেবলই দেখনদারি ছিল? না কি এটি ভারত-ইউরেপীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে একটি বড়োসড়ো পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে? পাকিস্তানের তরফে নিরন্তর কাশ্মীর নিয়ে যে অপপ্রচার চলে আসছে তাকে রুখতে এটি কি তবে counter offenssive-এর কাজ করবে? ভারতের হাতে কি নতুন হাতিয়ার উঠে আসবে? মাত্র কয়েকদিন আগেই পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীরের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় বদলে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। একটি জম্মু-কাশ্মীর, অপরটি লাদাখ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায়— 'ভারতীয়দের মধ্যে বাধা হয়ে থাকা অস্থায়ী দেওয়ালটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।' এই প্রশ্ন বা বিশ্লেষণগুলি নিয়ে ভাবার আছে।

সঠিক রাজনৈতিক প্রোটোকলের মাপকাঠিতে ধরলে ইউরোপের সাংসদীয় প্রতিনিধিদের এই সফরকে সে অর্থে সরকারি তকমা দেওয়া যাবে না। বাছাইকরা বিশেষ কিছু সাংসদ ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে, মত বিনিময়ের অভিপ্রায়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এ দেশে এসেছেন। কিন্তু যখন কোনো বিদেশি সাংসদদের প্রতিনিধি দল প্রথমে দেশের প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, শ্রীনগরে অধিষ্ঠিত ১৫টি বিশেষ পুলিশ বাহিনীর জিওসি সেখানকার মুখ্যসচিব, নগরপাল ও আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন তখন 'বেসরকারি সফর' তকমাটি একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ধারা ৩৭০ বিলেপের পর যখন শ্রীনগরে বাইরের লোকের আসা যাওয়া কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

অবশ্যই কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত তার দৃষ্টিকোণ, পরিস্থিতি নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তুলে ধরতেই পারে। তবে Madi Sharma যিনি নিজস্ব টুইটারে নিজেকে 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মধ্যস্থতাকারী' বলে বর্ণনা করেছেন তিনিই ছিলেন এই সফরটির আয়োজক। আন্তর্জাতিক

> "ভারতের হয়ে যাঁরা বিদেশে দৌত্য করতে যান তাঁদের হাতেও থাকে দেশের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ও খোলামেলা রাজনৈতিক আবহ বিদ্যমান থাকার আয়ুধ দুটি। সে কারণেই স্বাভাবিক রাজনীতির টানা পোড়েনকে আপনগতিতে চলতে দেওয়াই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেপটি ভালবের কাজ করবে।"

রাজনীতিবিদদের দেশে নিয়ে এসে আপ্যায়ন করা বিশ্ব কূটনীতিতে আদৌ নতুন নয়। এ কাজটা পাকিস্তান হরবকতই করে থাকে। এ প্রসঙ্গে গত ৭ অক্টোবর মার্কিন সেনেটর CH Hollen, Maggic Hassan Paul Jones পাকিস্তানের মোজাফ্‌রাবাদ সফরে যান। এই মোজাফরাবাদই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী। ভারতের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাংসদদের ভ্রমণের আয়োজনের পদ্ধতিটি কিছুটা নতুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন যদি বিদেশি প্রতিনিধিরা সেখনে গিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে তাঁদের বিশ্লেষণ তৈরি করতে পারেন তাহলে দেশীয় সাংসদরা সে সুযোগ পাবেন না কেন?এ বিষয়ে জার্মানি থেকে আসা সাংসদ বিরোধীদের সঙ্গে কিছুটা তাল মিলিয়েই বলেছেন তাঁরা সুযোগ পেলে ভারতীয় সাংসদদেরও আধিকার থেকেই যায়। তাই বিরোধীরা ভবিষ্যতে কবে সেখানে যেতে পারবে এ কৌতূহল তাঁদের থাকবেই।

গত ২৪ আগস্ট রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ৮ দলের এক প্রতিনিধি দলকে শ্রীনগর বিমান বন্দর থেকেই ফেরত পাঠানো হয়। এই বিষয়টার আর একটু কৌশলী মোকাবিলার দরকার ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কংগ্রেস নেতা ও জম্মু কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবি আজাদ সে রাজ্যে সফর করেছেন।

বিচ্ছিন্নভাবে না গিয়ে এই বার একটা

সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সফরসূচি ঠিক করে দিয়ে শ্রীনগরে পাঠানোর কথা ভাবা যেতে পারে। দেশের নিরাপত্তার কথাটি ধরে নেওয়া যায় সকলেই বোঝেন। আরও একটা কথাও মাথায় রাখা যেতে পারে ৩৭০ ধারা বাতিলের সময় সংসদের উভয় সভাতে বিরোধীরাও হাত খুলে সমর্থন দিয়েছিল। তাই একটা চাপা বিক্ষোভের পরিস্থিতিকে সঠিক পথে আসতে, দীর্ঘদিনের পুরনো বিরোধিতার মানসিকতাকে নিরাময় করতে একটি বহুদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আম জনতার কাছে পৌঁছনোর এটাও নতুন পথ হতে পারে।

কাশ্মীরে সদ্য ব্লক উন্নয়নের নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলো। দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষায় মোট ৮৮৮৩২ পরীক্ষার্থীর ৯৯ শতাংশ পরীক্ষায় বসেছে। বড়ো কম কথা নয়। শাসক দলের সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম্ স্বামী ও জোটসঙ্গী শিবসেনার কেউ কেউ এই সফরকে ভ্রান্ত পদক্ষেপ বলে ব্যাখ্য করেছেন। তাঁদের যুক্তিতে যেখানে ভারত বরাবর কাশ্মীরের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে আনার বিরোধী এই প্রচেষ্টা তাই স্ববিরোধিতার শামিল। সরকার অবশ্য এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। পররাষ্ট্র বিষয়ক দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে— ''দেশের প্রকৃত ও সত্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলকে সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল করা আর কোন পরিস্থিতিকে বিশ্ব পরিসরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে তুলে ধরে তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা আদৌ এক জিনিস নয়। দেশের দৃষ্টিকোণকে বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরা আর আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্যে আমূল পার্থক্য আছে। তবু এই পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞ রাজ মোহন একটু হালকা মেজাজেই বলেছেন— ''যাইহোক কাশ্মীর নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঘুম ছুটে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।'' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে দাঁড়ানোর ও দ্রুত উঠতি বাজারের নাগাল পেতে আজ বহু দেশই উদ্‌গ্রীব, তাই কাশ্মীর নিয়ে যে অযথা আতঙ্ক তাও বহুলাংশেই তিরোহিত হয়েছে। এই খেই ধরেই বলা যায় কাশ্মীরই হোক বা অন্য যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই ভারতের সব থেকে জোরের জায়গা ও সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ প্রদর্শনের বস্তু হলো দেশের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক পরম্পরা। ভারতের হয়ে যাঁরা বিদেশে দৌত্য করতে যান তাঁদের হাতেও থাকে দেশের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ও খোলামেলা রাজনৈতিক আবহ বিদ্যমান থাকার আয়ুধ দুটি। সে কারণেই স্বাভাবিক রাজনীতির টানা পোড়েনকে আপনগতিতে চলতে দেওয়াই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেপটি ভাল্‌বের কাজ করবে।

মানতেই হবে, ৩৭০ ধারা বিলোপের পর যে কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে তাতে হিংসা ও প্রাণহানি রোধ করা গেছে। কিন্তু ভিন রাজ্যের ট্রাকচালক বা পরিযায়ী শ্রমিক তাদের যেভাবে লক্ষবস্তু করে মারা হচ্ছে তা চিন্তার উদ্রেক করে। বিশেষ করে বিদেশি প্রতিনিধিদের সফরের সময়ই এমন হিংসার ঘটনা ঘটেছে যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। যে সমস্ত ভিন রাজ্যের শ্রমিক নিহত হয়েছেন তারা দীর্ঘদিন ধরেই কাশ্মীরে কর্মরত ছিল। এর অর্থ এই দাঁড়ায় সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরে অবশিষ্ট ভারতকে প্রবেশ করতে দিতেই রাজি নয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার Terrorism Portal-এর তথ্য অনুযায়ী এ বছরে কাশ্মীরে ২৬৭ জন হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১৭ সালে ৩৫৭ জন, ২০১৮ সালে ৪৫২ জনের মৃত্যুর প্রতিতুলনায় এবারের সংখ্যাটি নিশ্চয় নিম্নমুখী। কিন্তু মনে রাখতে হবে কাশ্মীরি মানসিকতা বড্ড দ্রুত বদলায়।

চিরাচরিত মানসিকতা অনুযায়ী যেমন চলছে চলুকের আপাত নিরাপদ পথ থেকে সরে এসে এ যাবৎকাল যা অচিন্ত্যনীয় ছিল সরকার সেই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দেখিয়েছে। ধারা ৩৭০ ধারা এক ধাক্কায় উঠিয়ে দিয়েছে। কাশ্মীর ছাড়া ভারতের অবিশিষ্টাংশে এ নিয়ে বিরোধিতাও কম বেশি থিতিয়ে এসেছে। এখন কঠিনতম পর্যায়টি শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হবে। ২০০০-২০১৬-এর মধ্যে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিকে দেওয়া ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকার সামগ্রিক অনুদানের ১০ শতাংশ কাশ্মীরে গেছে। এখন সব চেয়ে ভালো কাজ হবে এই টাকা সারা রাজ্যে সঠিকভাবে উন্নয়নের কাজে ছড়িয়ে দেওয়া। ভারতীয় গণতন্ত্রিক পরম্পরার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ-গুলিকে সেখানে সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং একই সঙ্গে মানুষজনকে বৈরিতা ভুলিয়ে একটি আবেগময় স্পর্শ পৌঁছে দেওয়া।

(লেখক প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

হাজি

গফুর মিঞা তাঁর স্ত্রীকে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন। যেমন তুমি আমার জান, তুমি আমার চান্দ, তুমি আমার আশমান। কখনো কখনো ডার্লিং, সোনা, সুইটি ইত্যাদি বলে স্ত্রীকে খুশি রাখতেন। তার স্ত্রীও আহ্লাদে গলে যেতেন। এর পর তিনি একদিন হজে গেলেন। হজ থেকে ফিরে এসে তিনি স্ত্রীকে কোনো রকম মিষ্টি কথা বলেন না। কোনো আদরও করেন না। কোনো দরকার পড়লে কেবল হাফিজের মা বলে ডাকেন। স্ত্রী একদিন বলল, কীগো হজ থেকে ফিরে তুমি আদর করে কথা বলো না কেন? গফুর মিঞা বললেন, আমি এখন হাজি হয়েছি গো। হজ থেকে ফিরে আর মিথ্যা কথা বলতে নেই।

চীনা মাল

ঘন্টু আর সেন্টু দুই বন্ধু। ঘন্টুর বাবা বামপন্থী রাজনীতি করেন আর সেন্টুর বাবা ব্যবসায়ী। তার দোকানে চীনা মালপত্র বিক্রি হয়। কেন্দ্রীয় সরকার চীনা মালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চায় শুনে ঘন্টু বলল, 'এবার তোদের ব্যবসা লাটে উঠল। চীনা মাল না পাওয়া গেলে তোদের দোকান চলবে কী করে?' শুনে সেন্টু বলল, ' তোরাও তো চীনা মালের ব্যবসা করিস। তোদেরই বা দোকান চলবে কী করে?

বায়ুদূষণ রোধে গৃহীত ব্যবস্থার পর্যালোচনা প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বায়ুদূষণ রোধে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লির পক্ষ থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ড. পিকে মিশ্র সেগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করেছেন। তিন রাজ্যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ফসলের গোড়া পোড়ানো এবং আগুন লাগার ঘটানাগুলির প্রেক্ষিতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই প্রসঙ্গে জানতে চান। পঞ্জাবের মুখ্য সচিব জানিয়েছেন যে, রাজ্যের যেসব জেলায় ফসলের গোড়া পোড়ানো হয়, সেই জেলাগুলির ওপর তিনি এবং সংস্লিষ্ট জেলাগুলির ডেপুটি কমিশনাররা নজর রাখছেন। ১৯৮১-র বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘনের জন্য একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হচ্ছে। আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করার পাশাপাশি রাজ্য সরকার কড়া ব্যবস্থাও নিচ্ছে।

পর্যালোচনা বৈঠকে হরিয়ানার মুখ্য সচিব জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যত দ্রুত সম্ভব ফসলের গোড়া পোড়ানোর ঘটনা বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। সচিবের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক দল ২৪ ঘণ্টা কাজ করে চলেছেন। দিল্লির মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, জল ছিটানোর কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে। অত্যধিক দূষণ কবলিত এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শহরে খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা হয়েছে।। এজন্য সর্বাধিক জরিমানা নেওয়া হচ্ছে এবং আইন লঘ;লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধেও জরিমানা সহ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উবাচ

"অসমের ভবিষ্যতের জন্য সদ্য প্রকাশিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি হচ্ছে এক সর্বশ্রেষ্ঠ নথি। কতজন লোকের নাম বাদ পড়লো সেটা বড়ো কথা নয়। বিচার্য হলো, দীর্ঘ সময় ধরে অসমকে গ্রাস করে থাকা বিদেশি সমস্য সমাধানে এটা কতটা সহায়ক হবে।"

রঞ্জন গগৈ
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

অসমে সদ্য প্রকাশিত নাগরিকপঞ্জি নিয়ে তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে

"ভয়াবহ পরিস্থিতি দেশের রাজধানী এলাকার। জরুরি অবস্থার চেয়েও বর্তমান পরিস্থিতি শোচনীয়। নিজের চোখে দূষণের ভয়াবহ অবস্থা দেখেছি।"

অরুণ মিশ্র
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

রাজধানী দিল্লিতে ধোঁয়ার জেরে সৃষ্ট দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে

"টিপু একজন অত্যাচারী ও ধর্মান্ধ শাসক ছিলেন। তিনি জোর করে বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার জন্মদিন পালন করা উচিত নয়।"

জি মধুসূদন
কর্ণাটকের বিজেপি মুখপাত্র

টিপু সুলতানের জন্মদিন পালন করা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এক পুলিশ অফিসার ইজরায়েল থেকে ফোন ট্যাপ করার সফটওয়্যার নিয়ে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে কে ফোন ট্যাপ করে।"

বাবুল সুপ্রিয়
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

মমতা ব্যানার্জির ফোন ট্যাপের অভিযোগের জবাবে

ভারতের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি একটি সময়ের দাবি

ড. সুদীপ ঘোষ

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিল তার মধ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি করার উদ্যোগ অন্যতম। এই উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আনা হয় যা লোকসভায় বিরোধিতার জন্য সরকার বিলটিকে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে পাঠাতে বাধ্য হয়। তিন বছর বাদে ২০১৯ এর জানুয়ারি মাসে বিলটিকে ফের নতুনভাবে আনা হয় কিন্তু লোকসভা ভোট এসে যাওয়াতে ফের বাধা আসে। ২০১৯-এ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এনডিএ ফিরে আসার পর বিলটিকে ফের নিয়ে আসা হয় এবং সেটি লোকসভায় পাশ করে রাজ্যসভায় পাশ করা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষায়। রাজ্যসভায় পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে সারা দেশে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি হবে বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে যেখানে অনুপ্রবেশের সমস্যা রয়েছে।

এখন সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা NRC (National Registrar of Citizen)-র কী প্রয়োজন? এর উত্তরে বলতে হয় একটি পরিবারের কর্তাকে যেমন হিসাব রাখতে হয় পরিবারে কজন আছেন, কজনের রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক তেমনই একটি রাষ্ট্রপ্রধানকে হিসাব রাখতে হয় তার দেশে কতজন নাগরিক রয়েছে যাতে যে সরকারি সুযোগ সুবিধা অনুদান পাঠানো হয় সেটি দেশের নাগরিক ছাড়া বাইরের কেউ মানে অনুপ্রবেশকারীরা ভাগ না বসায়, রুটি রুজি ছিনিয়ে না নেয়। দুনিয়ার নিয়ম হলো সুখী ও সম্পন্ন প্রতিবেশীর ঘরে, দুঃখী ও দরিদ্র প্রতিবেশীরা ভিড় জমায়। এই ভিড় যখন কাম্য হয়না তখন বেড়া দিতে হয়। ব্যারিকেড বসাতে হয় যাতে আটকে দেওয়া যায় এই অবাঞ্ছিতদের ভিড়। দেশকে রক্ষা করা যায় ধর্মশালা হয়ে যাওয়ার হাত থেকে। জাতীয় নাগরিকপঞ্জিও সরকারের হাতে থাকলে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যায় ও বিতাড়ন করা যায়। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে এই ব্যবস্থা আছে। তাই জাতীয় নাগরিকপঞ্জি গঠন একটি সময়ের দাবি।

এখন প্রশ্ন হলো অনুপ্রবেশকারী কাদের বলব? রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক কমিটির এব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশিকা রয়েছে। তারা বলছে ধর্মীয় নিপীড়নের কারনে যদি কোনো ব্যক্তি একদেশ থেকে অন্যদেশে চলে আসতে বাধ্য হয় তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না। তাদেরকে শরণার্থী আখ্যা দিতে হবে। যেমনটা সব অমুসলমান মানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। আর এই সমস্ত ইসলামিক দেশ থেকে যেসমস্ত মুসলমান বেআইনিভাবে ভারতবর্ষে এসেছে শুধুমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য এদেশের সম্পত্তি ব্যবহার করে সুখে থাকবে বলে—তাদেরকে বলা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। ভারতীয় জনতা পার্টি খুব পরিষ্কার করে বলছে যে তারা শরণার্থীদের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরির মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেবে কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের দেবে না।

অনেক ঘাম রক্ত ঝরানোর পর বাম-ঐস্লামিক গোষ্ঠীর চক্রান্ত বানচাল করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের উপহার দিয়েছেন তা যেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়। হিন্দু বাঙ্গালিদের এই বাসভূমি যেন সাময়িক লাভ ও লোভের রাজনীতি, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় তোষণের জন্য হাতছাড়া না হয়ে যায়।

এমন অনেকের মনে প্রশ্ন হলো সব মুসলমান কি অনুপ্রবেশকারী? উত্তরটা অবশ্যই না। যেসমস্ত মুসলমান বাংলাদেশ তৈরি হবার আগে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের আগে এদেশে এসেছেন তাদের ভারতীয় মুসলমান বলে গণ্য করা হবে এবং তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। বিজেপি ছাড়া ভারতবর্ষের বেশিরভাগ অনান্য রাজনৈতিক দল মুসলমান ভোটের লোভে বলছে ধর্মের ভিত্তিতে শুধুমাত্র অমুসলমানরাই এদেশের নাগরিকত্ব পাবে এমন আইন তারা করতে দেবে না। তার অর্থ এই দাঁড়ায় বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে যেই আসবে তারাই ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। মুসলমানদেরও অধিকার থাকবে বাংলাদেশ ছেড়ে এখানে এসে নাগরিক হওয়ার। এই অধিকার যদি সেসব দেশের মুসলমানরা না পায় তাহলে হিন্দুরাও পাবে না। এখন যারা এই যুক্তি দিচ্ছেন তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন ১৯৪৭ সালে মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল—তাহলে সেখানকার মুসলমানদের এদেশে আসাটা কি বৈধ যখন তাদের নিজেদের দেশ রয়েছে? ওইসব দেশের যারা

অমুসলমান রয়েছে যারা অত্যাচারিত, ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া ভারতের ঐতিহ্য। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে নিপীড়িতদের আশ্রয় দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে। তাই বিজেপি শরণার্থীদের আশ্রয় দেবে কিন্তু অনুপ্রবেশকারীকে কখনই না।

এখন প্রশ্ন হলো, ভারতবর্ষে এই অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত? এর উত্তরে বলতে হয় ভারতে অনুপ্রবেশ হয় যে দেশগুলি থেকে তার মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও আছে মায়ানমার, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান। মায়ানমার থেকে আগত বার্মিজরা মূলত আছে মিজোরামে। এদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এছাড়া ওই দেশ থেকে আগত পঞ্চাশ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান ধরলে সংখ্যাটা মোট দাঁড়ায় দেড় লক্ষ। এছাড়া আফগানিস্তান থেকে প্রায় ১৫০০০ এবং পাকিস্তান থেকে প্রায় ৭০০০ অনুপ্রবেশকারী এদেশে রয়েছে। এই তিনদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে মাথাব্যথার কারণ নেই যেটা আছে বাংলাদেশিদের নিয়ে। ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী যেটা ১ কোটি ৮০ লক্ষ যা বর্তমানে ৩ কোটি পৌঁছালেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বলাবাহুল্য এই অনুপ্রবেশের ফলে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে জনবিন্যাসে পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে যেখানে অমুসলমান ছিল ৯০% এবং মুসলমান ছিল ১০%, সেখানে ২০১১তে এসে দাঁড়িয়েছে অমুলমান ৮৫% এবং মুসলমান ১৫%। মুসলমানাদের মধ্যে শিশুজন্মের হার বেশি বলেই যে এদেশে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনটা কিন্তু নয় তার প্রমাণ পরের তথ্যগুলি থেকে পাওয়া যাবে। ২০১১ এর রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানে শেষ দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৬% এবং বাংলাদেশে ১৪% অথচ ভারতে মুসলমান বৃদ্ধির হার প্রায় ২৫%। শতকরা ৭০ ভাগ মুসলমান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকেও কম। এটা কী করে সম্ভব? সম্ভব হচ্ছে এই কারণেই যে সেদেশ থেকে হিন্দুরা তো আসছেই মুসলমানরাও আসছে। তাই ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা এমন উচ্চ হারে বৃদ্ধি। এরপরও কি অনুপ্রবেশ সমস্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে?

এবার আসি অসমের এনআরসি প্রসঙ্গে। অসমের এনআরসি ভারতের নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ এবং তার পরবর্তী সংশোধনীর উপর নির্ভর করে হয়নি। এটি হয়েছে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও 'অগপ' এ-র মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। এটি সংসদে তৈরি করা কোনো আইন নয় যে সারা ভারতে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যারা অসম চুক্তির ভিত্তিবর্ষ পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য হবে ধরে নিয়ে শোরগোল তুলছেন তারা জেনে শুনেই এনআরসি যাতে না হয় তার জন্য মিথ্যাচার করছেন। অসম চুক্তি অনুযায়ী ভিত্তিবর্ষ ও তারিখ ২৪/৩/১৯৭১ নয় ১.১.১৯৬৬। এই চুক্তি অনুযায়ী যারা ১.১.১৯৬৬ এর আগে অসমে এসেছেন তারা নাগরিকপঞ্জিতে নথিভুক্ত হবেন। যারা ১.১.১৯৬৬ থেকে ২৫.৩.১৯৭৭ এর মধ্যে এসেছেন তারা প্রাথমিকভাবে নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ গেলেও দশ বছর পর এন আর সি-র অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং ২৪.৩.১৯৭১ এর পর যারা এসেছেন তাদেরকে বিতাড়ন করা হবে। এটাকে ভিত্তি ধরে ১.১.১৯৬৬ থেকে ২৪.৩.১৯৭১ পর্যন্ত মোট প্রায় ৭৫ হাজার জনকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের মধ্যে একজনও বাঙ্গালি নেই। অতএব বাঙ্গালিদের জন্য out of date কার্যকর হচ্ছে ২৪.৩.১৯৭১ থেকে। এই তারিখের আগে যারা এসেছেন তারা নাগরিকপঞ্জির অর্ন্তভুক্ত হবেন এর পরে এলে হবেন না। তবে এই নাগরিকপঞ্জি অনুযায়ী প্রায় ৭ লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ চলে গেছে তাই বিজেপি অসমের এই এন আর সি এর বিপক্ষে। বিজেপির বক্তব্য সারা দেশে যে নিয়মে এনআরসি হবে অসমেও সেই নিয়মে হবে। তাই অসমে আবার এনআরসি হবে এবং তা হবে সারা দেশের সঙ্গে একসাথে।

এবার আসি সেই প্রসঙ্গে কারা পাবেন ভারতের নাগরিকত্ব। ভারতের নাগরিকত্ব আইন তৈরি হয় ১৯৫৫ সালে। তারপর তিনবার সেটির সংশোধন হয়। সর্বশেষ হয় ২০০৩ সালে। পুরানো নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না, যদিও থাকা উচিত ছিল। সেই কারণে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে এই সমস্যার মূলে আঘাত করেন অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা Citizen Amendment Bill (CAB) নিয়ে আসেন। এই বিলটি ২০১৯ সালে নতুনভাবে নিয়ে আসার পর যা বলা হয় সেটি হলো—

(১) পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা Cut of date 24/3/1971 এর পরে আসলে নাগরিকত্ব পাবেন না।

(২) ওই তিন দেশ থেকে আগত সমস্ত শরণার্থী Cut of date 31/12/2014 এর আগে এদেশে আসলে নাগরিকত্ব পাবেন।

(৩) ওই তিন দেশ থেকে আগত শরণার্থী যারা ভারতে এক বছর ধরে বসবাস করছেন তারা নাগরিকত্ব পাবেন।

সবশেষে বলতে হয় অনেক ঘাম রক্ত ঝরানোর পর বাম-ঐস্লামিক গোষ্ঠীর চক্রান্ত বানচাল করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের উপহার দিয়েছেন তা যেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়। হিন্দু বাঙ্গালিদের এই বাসভূমি যেন সাময়িক লাভ ও লোভের রাজনীতি, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় তোষণের জন্য হাতছাড়া না হয়ে যায়। এখনও যদি আমরা সতর্ক না হই আমরা আমাদের উত্তরপুরুষদের কাছে কৈফিয়ত দিতে পারব না। এই ভয়ংকর পরিণামের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র এনআরসি। একজনও হিন্দু, একজনও এদেশের অমুসলমান, একজন ভারতীয়কে ভারত ছেড়ে যেতে হবে না। এই আশ্বাস নরেন্দ্র মোদীর, এই অঙ্গীকার ভারতীয় জনতা পার্টির। গুজবে কান দেবেন না। প্ররোচনাতে বিভ্রান্ত হবেন না। দেশবিরোধী শক্তি বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাদের এই অপচেষ্টাকে রুখে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবর্ষে এনআরসি চালু হোক এই আমাদের সকল দেশপ্রেমিকের দাবি।

টিপু সুলতান দেশপ্রেমিক নন মোটেই

পারুল মণ্ডল সিংহ

২০ নভেম্বর ১৭৫০ সালে বর্তমান ব্যাঙ্গালোরে টিপু সুলতান (দেবানাহল্লী) জন্মগ্রহণ করেন। মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু ওহিয়ার রাজবংশকে সরিয়ে হায়দার আলি ১৭৬০ সালে শ্রীরঙ্গপত্তনম্‌কে রাজধানী করে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এই হায়দার আলি ও ফাতিমা ফকরউন্নিশাহ-র পুত্র ফতেহ আলি ইতিহাসে টিপু সুলতান নামে পরিচিত হন। স্থানীয় সুফি সন্ত টিপু মস্তান আওলিয়ার নাম অনুকরণে তার প্রচলিত নাম হয় টিপু সুলতান। টিপুর পিতা হায়দার আলি যে সময় মহীশূরের সিংহাসনে বসেন সেই সময় ইংরেজরা সবেমাত্র পলাশীর যুদ্ধ জয় করে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে ভারতীয় উপনিবেশ দখলে জোর সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এই ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বে দক্ষিণ ভারতের ভারতীয় রাজবংশগুলি প্রায় প্রত্যেকেই ফরাসি শক্তিকে নতুবা ইংরেজশক্তিকে তাদের সমর্থন জানিয়েছিল।

হায়দার আলির সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই মহীশূর সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ শুরু হয়েছিল এবং সেই বিরোধ উত্তরাধিকার সূত্রে টিপু সুলতানও পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজরা সারা ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় ও ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশ বানাতে সফল হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বা বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে ব্রিটিশদের অত্যাচার ও শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসনমুক্ত করার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল টিপু সুলতানের ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধ কি তারই অংশ ছিল? মহীশূরের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতা বিভিন্ন কারণে গড়ে ওঠে। হায়দার কর্তৃক মহীশূরের ক্ষমতা দখলে আরেক বিদেশি শক্তি ফরাসিদের বিশেষ অবদান ছিল। শুধু তাই নয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধে তিনি ফরাসিদের সমর্থন করেন। স্বভাবতই ইংরেজরা হায়দার বিরোধী হয়ে ওঠে।

যদিও পরবর্তীকালে (১৭৬৬) ইংরেজরা ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠলে হায়দার ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে নানান চেষ্টা চালান। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হননি। ১৭৬৭ সালে শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। মাদ্রাজের সন্ধির (১৭৬৯ খ্রি:) মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান হলেও পুনরায় ১৭৮০ সালে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন ১৭৮২ সালে হায়দারের অকস্মাৎ মৃত্যু হলে হায়দার পুত্র টিপু যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তারপর ১৭৯০ ও ১৭৯১ সালে আরো দুটি ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ হয়েছিল টিপুর নেতৃত্বে। যুদ্ধক্ষেত্রেই টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়।

টিপুর মতো ধর্মীয় উন্মাদ শাসককে দেশপ্রেমিক আখ্যা দেওয়া নির্লজ্জ তুষ্টীকরণের রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই হয়তো তৎকালীন বিশ্বখ্যাত কবিরা শিবাজী, রাণাপ্রতাপ এমনকী দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণদেব রায়ের মহানুভবতা নিয়ে কাব্য, কবিতা বা উপন্যাস রচনা করলেও টিপুসুলতানের 'দেশপ্রেম' নিয়ে কেউ কলম ধরেননি।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিরোধী শক্তি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া টিপু 'দেশপ্রেমিক' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য কি? তিনি আর কোনো উদাহরণ রেখে গিয়েছিলেন? কর্ণাটক সরকার টিপু সুলতানের ২২৬তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিলেও কেন কর্ণাটক-কেরল সীমান্তবর্তী (কুর্গ) বা কোডগু অঞ্চলের মানুষেরা টিপুর এত বিরোধী? তারা কোনো মতেই টিপুকে দক্ষিণ ভারতের বা কন্নড় নায়ক মানতে রাজি নন। কথা হলো দেশপ্রেমিক হতে গেলে নিজের দেশকে ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরি। দেশ অর্থাৎ স্বদেশ,

মাতৃভূমি এবং এই মাতৃভূমির প্রত্যেকটি মানুষের মঙ্গলকামনা, হিতসাধন সর্বোপরি বিদেশি শক্তির উচ্ছেদ সাধন করে 'স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন— দেশপ্রেমিক বা স্বাধীনতা সংগ্রমী হতে গেলে এগুলি অপরিহার্য।

টিপু সুলতান বর্তমান কর্ণাটক ও কেরলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। টিপুর শাসনকালে এই অঞ্চলে তার রাজ্যবাসীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু। খ্রিস্টানরাও এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। টিপু তার শাসনকার্য চলানোয় ইসলমিক ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক হিসেবে নয় ইসলামের প্রসারের জন্যই তিনি কর্ণাটক ও কেরলের নানা অঞ্চল জয় করেন। ১৯২৩ সালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে. এম. পানিক্কর 'ভাষা পোসিনি' পত্রিকায় টিপু সুলতানের সমসাময়িক নানা ঘটনার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন (Tipu Sultan : Villain or Hero. Edited by Sita Ram Goel). ১৭৮৮ সালের ২২ মার্চ তিনি আবদুল কাদিরকে চিঠি লিখে জানান যে ১২০০০ এরও বেশি হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে। এই খবরটি বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে অন্যান্য হিন্দুরাও নিজে থেকে ইসলাম গ্রহণ কারে। তিনি বার বার সতর্ক করছেন যে একটিও নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ যেন বাদ না যায়। ওই বছরই ১৪ ডিসেম্বর কালিকটে অবস্থিত তার সেনাধ্যক্ষকে চিঠি লিখে নির্দেশ দেন যে মির হুসেন আলি ও আরও ২ জনকে তিনি পাঠাচ্ছেন। তাদের সাহায্যে কালিকটের একটি হিন্দুও যেন বেঁচে না থাকে। এমনকী তিনি এমন নির্দেশও দিয়েছেন যে ২০ বছরের কম যাদের বয়স তাদের বন্দি করে রাখতে। এবার অন্তত ৫০০ হিন্দুকে যেন গাছের উপর থেকে ফেলে মারা হয়। নিজ রাজ্যে হিন্দুদের এমন গণহত্যা সংঘটিত করার পর উৎসাহী টিপু ১৭৯০ সালে (১৮ জানুয়ারি) আব্দুল দুলাইকে চিঠিতে কালিকটে তার জিহাদ সফল হওয়ার সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে কালিকটে আর একটি হিন্দুও বেঁচে নেই। উল্লেখযোগ্য যে এই তথ্যগুলি যখন প্রকাশ হয়েছিল তখন কিন্তু টিপুকে 'দেশপ্রেমিক' বলা যেতে পারে কিনা এই ধরনের কোনো বির্তকের সূত্রপাত হয়নি।

টিপুর চরম হিন্দু বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতার উদাহরণ পাওয়া যায় তার কোডাগু বা বর্তমান কর্ণাটকের কুর্গ জেলা অভিযানে। কিছু ঐতিহাসিক দাবি করেছেন যে তিনি ৪০ হাজার কুর্গবাসীকে হত্যা করেছেন। অসংখ্য হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। 'হয় ইসলাম না হয় মৃত্যু'— এই নীতিতে গোটা কুর্গবাসীকে মৃত্যুমুখে নামিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানকার খ্রিস্টান প্রজাদেরও ছাড়েননি। ১৯৮০ সালে মহীশূর থেকে প্রকাশিত আই. এম. মুথানা'র লেখা 'Tipu Sultan X-Rayed' গ্রন্থটিতে তিনি টিপুর এই গণহত্যার বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ-সহ বিবরণ দিয়েছেন।

টিপুর সমসাময়িক বিদেশি পর্যটক যারা শ্রীরঙ্গপত্তনম্ এবং মহীশূরে ভ্রমণ করেছিলেন ও টিপুর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তারাও টিপুর বর্বরতার বর্ণনা করে গেছেন। পর্তুগিজ পর্যটক বার্থোলোমেউ যিনি ১৭৯০ সালে টিপুর সফরে সঙ্গী ছিলেন তিনি লিখছেন যে, ''টিপু সুলতান যাচ্ছেন, তার পেছনে প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যদল রয়েছে। কালিকটের বেশিরভাগ মানুষকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে মায়েদের ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর মায়েদের গলায় বাচ্চাদের ফাঁস দিয়ে বেঁধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'' তিনি আরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, কীভাবে হিন্দু ও খ্রিস্টান প্রজাদের হাতির পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মন্দির ও চার্চগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ফ্রাঙ্কোইস ফিডেল নামক একজন ফরাসি সৈন্য যিনি মরিশাস থেকে মহীশূর এসেছিলেন টিপুর পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর লেখা কিছু তথ্য ১৯৮৮ সালে প্যারিসে পাওয়া যায়। সেই সৈন্য লিখেছেন যে ম্যাঙ্গালোর অধিকার করার পর টিপু নিরপরাধ ব্রাহ্মণদের কাটা মাথা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন যাতে বাকি হিন্দুরা ভয় পায়। কোঝিকোড়ের ২০০০ ব্রাহ্মণ হিন্দুকে তিনি হত্যা করেন।

এছাড়া দক্ষিণ ভারতের বহু ঐতিহাসিক টিপুর স্বৈরাচারিতার বহু উদাহরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এহেন ধর্মবিদ্বেষী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসককে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? অবশ্যই টিপু সুলতান অত্যন্ত আধুনিকতার সঙ্গে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। রকেট টেকনোলজি উদ্ভাবন করা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর নিয়ম-কানুন সম্পর্কে নতুন নতুন বিধি ব্যবস্থা সবই টিপু সুলতান করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনোমতেই ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। একজন শাসক যদি নিজের প্রজাগণকে নির্মমভাবে হত্যা করেন তাদের ধর্ম ইসলাম নয় বলে, তাহলে আর যাইহোক কোনো নিরিখেই তাকে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি নিজের রাজ্যেই জেহাদের ডাক দিয়ে হাজার হাজার হিন্দু প্রজাকে হত্যা করেন। 'জেহাদ'কে বা হিন্দুপ্রধান কন্নড় রাজ্যকে ইসলামি রাজ্যে পরিণত করাকে কি স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যেতে পারে? টিপুর এই চরিত্রের সঙ্গে কিন্তু দেশপ্রেম, দেশভক্তি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে জাতির উন্নতি কোনো কিছুরই মিল পাওয়া যায় না। তাই টিপুর শাসনাধীন অঞ্চলের মানুষরাই তাকে কোনোভাবে 'কন্নড় নায়ক' মানতে রাজি নন। টিপুর চোখে ছিল শুধু ইসলাম প্রসারের লক্ষ্য। তাই তার সাম্রাজ্যের শেষের দিকে কন্নড়ের মতো উন্নত ভাষাকে সরিয়ে বিদেশি ফার্সি ভাষাকে সরকারি ভাষা করে দেন। মহীশূর সাম্রাজ্যের নানা ঐতিহ্যপূর্ণ শহরের প্রাচীন হিন্দু নাম পাল্টে আরবি নাম রাখেন যেমন--- ম্যাঙ্গালোরের নাম পাল্টে করেন জালালাবাদ, মহীশূরকে নাজারাবাদ, জিন্দিগুলকে খালিফাবাদ, রত্নাগিরিকে মুসতফাবাদ, কোঝিকোড়কে নাম পাল্টে করেন ইসলামাবাদ। টিপুর মতো ধর্মীয় উন্মাদ শাসককে দেশপ্রেমিক আখ্যা দেওয়া নির্লজ্জ তুষ্টীকরণের রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই হয়তো তৎকালীন বিশ্বখ্যাত কবিরা শিবাজী, রাণাপ্রতাপ এমনকী দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণদেব রায়ের মহানুভবতা নিয়ে কাব্য, কবিতা বা উপন্যাস রচনা করলেও টিপুসুলতানের 'দেশপ্রেম' নিয়ে কেউ কলম ধরেননি। ■

সিরাজ-উদ-দৌলা কি প্রকৃতই বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন

বিনয়ভূষণ দাশ

বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব বলে কথিত সিরাজ-উদ-দৌলাকে কেন্দ্র করে আবার মধ্যবাঙ্গলায় একটা অন্য ধরনের ভাবাবেগ তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও আরও কয়েকটি জেলায়। বাংলাদেশের কিছু লোকজনও এই প্রচেষ্টায় শামিল। সিরাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনাচক্র ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ও লালবাগে। বাংলাপক্ষ নামে এক স্বয়ম্ভু ফেসবুককেন্দ্রিক সংস্থাও এতে শামিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশকে নিয়ে পুরনো বাংলা সুবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন কিছু মানুষ। এক সময়ে সিরাজকে কেন্দ্র করে পরাধীন যুগে একটা দেশপ্রেমের হাওয়া তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল কিছু আবেগনির্ভর নাটক ইত্যাদি। শচীন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্র, নবীনচন্দ্র সেন এঁরা সিরাজকে নিয়ে পুস্তক, নাটক, কাব্য ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তথ্যের চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্য ছিল বেশি। আমাদের বালকবেলায় সিরাজ ছিল 'নায়ক'-এর আসনে। নাটকের সিরাজের সংলাপ ছিল কণ্ঠস্থ। বিদ্যালয়বেলায় তাই পলাশী এবং সিরাজের ইতিহাস জানতে আগ্রহী হয়েছিলাম স্বাভাবিকভাবেই। পরে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে মুর্শিদাবাদ তথা বাঙ্গলার নবাবি আমলের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পাঠ করেছি। বালকবেলার সেই আবেগের সঙ্গে যুক্তি আর তথ্যনিষ্ঠা যুক্ত হয়েছে। যাইহোক, সিরাজ-উদ-দৌলা উপাখ্যান ইতিহাসে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর রাজত্বকৃতির জন্য নয়; পরন্তু তাঁকে হারিয়ে ইংরেজরা তাঁদের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য। ইদানীং সিরাজের এক বছর কয়েকমাসের রাজত্ব এবং পলাশীর যুদ্ধের পরে প্রায় ২৬০ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই ঘটনা আজও বাঙ্গালি জীবনকে আলোড়িত করে। যদিও সেই সময় সমকালীন পদস্থ রাজকর্মচারী এবং স্বয়ং নবাবরা সকলেই নিজে ক্ষমতা দখলের জন্য একে অপরের বিরোধিতা করতে পিছপা হতো না। তাঁদের এই আচরণে দেশপ্রেমের ছিঁটেফোঁটাও থাকত না। ব্যক্তি স্বার্থের জন্য তাঁরা এমনকী নিজের প্রভু বা নবাবের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করত। মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এভাবেই ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

২৩ জুন ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ বাঙ্গলা তথা ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। আর জড়িয়ে গেছে বাঙ্গলার তৎকালীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নাম। ইংরেজদের হাতে ভারতের স্বাধীনতা হারানোর শুরুর ইতিহাসেও পলাশী এবং সিরাজের নাম যুক্ত হয়েছে। সিরাজ এবং পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে অনেক ইতিহাস যেমন লেখা হয়েছে তেমনই লেখা হয়েছে কাব্য, নাটক, যাত্রাপালা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই আবহে সিরাজ পেয়েছে স্বাধীনতাযোদ্ধার মর্যাদা। ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবোধের আবহে অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখেছিলেন সিরাজদৌলা। শচীন সেনগুপ্তও লিখেছিলেন। আবার মুর্শিদাবাদ জেলা এবং তার লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় সিরাজকে নায়ক বানিয়ে সিরাজের সময়কার 'বাংলা সুবে' বানানোর একটা বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ। এতে দু'দেশের কিছু শিক্ষিত মানুষও শামিল হচ্ছেন। তাঁরা লালবাগ- মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে সিরাজকে কেন্দ্র করে কিছু সভা-সমিতি এবং বার্ষিক সেমিনারও শুরু করেছে। মূলত এই প্রকল্প বাংলাদেশের হলেও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং অন্য জেলার কিছু মানুষ এতে শামিল। কখনো কখনো এঁরা 'বাংলাপক্ষ' নামে ফেসবুক নির্ভর একটি ভারতবিরোধী সংস্থারও মদত পাচ্ছে। এমত অবস্থায় সিরাজ-উদ-দৌলা ও তৎকালীন বাঙ্গলার বিষয়ে কিছু আলোচনা ও লেখালেখির প্রয়োজন আছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ (তখন দেওয়ান) ঢাকায় অবস্থান কালে স্বয়ং বাঙ্গলার তৎকালীন নবাব তথা বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নাতি আযিমুশ্বানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আবার মুর্শিদকুলির পরে তার নাতি সরফরাজ খাঁ তাঁর নিজের পিতা সুজাউদ্দিন খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল। আর আলিবর্দি

তো স্বয়ং তাঁর প্রভু সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে নিহত করেই নবাব হন। তিনি বাদশাহ-স্বীকৃত নবাব ছিলেন না। দিল্লির দরবারে নানা উপঢৌকন এবং অর্থ পাঠিয়ে তার বিনিময়ে নবাবি সনদপ্রাপ্ত হন। আলিবর্দি খাঁ তো নানা সময়ে কথার খেলাপ এবং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তাঁর মসনদ টিকিয়ে রাখেন। দিল্লির বাদশাহ আগেই বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার 'চৌথ' আদায়ের অধিকার মারাঠা রঘুজী ভোঁসলেকে এক চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরেও কী করে বাদশাহ আলিবর্দিকে বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার নবাবি 'সনদ' প্রদান করলেন তাও এক প্রহেলিকা! এছাড়াও আলিবর্দি খাঁ মারাঠাদের ওড়িশার চৌথ আদায়ের অধিকার দান এবং বিহারের জন্য বারো লক্ষ টাকা মারাঠাদের দেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির কোনোটিই তিনি পালন করেননি। সব ক্ষেত্রেই তিনি চুক্তির শর্ত খেলাপ করেছিলেন। আবার মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে চুক্তি করবেন বলে আমন্ত্রণ করে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করেন। ঐতিহাসিক

সিরাজদ্দৌলা

এইচ বেভারিজের সূত্রে জানা যায়, সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন আহমেদ শ্বশুর আলিবর্দিকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। তো, এই ধরনের পরিবেশের মধ্যেই বড়ো হয়েছিলেন তরুণ সিরাজ। আবার নবাব হবার আগেই একবার সিরাজ তাঁর দাদু, নবাব আলিবর্দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ বাঙ্গলার নবাবি 'সিস্টেম' বা পদ্ধতির মধ্যেই সে স্ফুরিত হচ্ছিল

ঘসেটি বেগম

বাল্যবয়স থেকেই। ১৭৫৬ সালে দাদু আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পরে দাদুর মনোনীত প্রার্থী সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হলেন অনেকের আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও। আর সিরাজ-উদ-দৌলা এতই দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত এবং নিষ্ঠুর ছিলেন যে তাতে বাঙ্গলার অমাত্যবর্গই শুধু নয়, সাধারণ প্রজারাও তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া এই রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটও দেখা যাচ্ছিল। আর ছিল মুসলমান শাসনের নিপীড়নে নির্যাতিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মুসলমান নবাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এক তীব্র আকুতি।

এই প্রসঙ্গে সিরাজদৌলার চরিত্রকথা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। দাদু আলিবর্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার সময়েই ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে বিহারে সিরাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জৈনুদ্দিন আহমেদ ও মাতা আমিনা বেগম। আমিনা আলিবর্দি খার কনিষ্ঠা কন্যা। সিরাজের জন্মের সময় থেকেই আলিবর্দির সৌভাগ্যের শুরু হয় বলে আলিবর্দি তাঁকে পালিতপুত্র রূপে গ্রহণ করে তাঁকে অন্ধস্নেহে মানুষ করেন। ফলে খুব কম বয়সেই তাঁর চারিত্রিক স্খলন ঘটে। সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের লেখক গোলাম হোসেন খাঁ সিরাজ সম্পর্কে নানান কটূক্তি করেছেন। তাঁকে 'অজ্ঞ অর্বাচীন যুবক', যে ন্যায়-অন্যায়ের তফাত বোঝে না, রূঢ়ভাষী ও হৃদয়হীন, দয়ামায়াহীন, উদ্ধত ব্যবহার, অহংকার ও অজ্ঞতায় যার মাথা খারাপ হয়েছে, যে যৌবন, ক্ষমতা এবং আধিপত্যের নেশায় বুঁদ ইত্যাদি নানা কটূক্তিতে বিদ্ধ করেছেন। আবার রিয়াজুস-সালাতিনের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন সেলিমও সিরাজকে 'বদমেজাজি ও রূঢ়ভাষী বলে সমালোচনা করেছেন। সিরাজ তাঁর দরবারের সমস্ত অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং সেনাপতিদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। ওই সময়ের সমস্ত ইউরোপীয় লেখকেরা তাঁর চরিত্রের বিরোধিতা করেছেন। এমনকী তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু, কাশিমবাজারের ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ জা লও তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, সিরাজের চরিত্র ছিল জঘন্যতম আর লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতায় ভরপুর। লিউক স্ক্র্যাফটন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, সিরাজ সর্বদাই লাম্পট্য ও অতিরিক্ত মদ্যপানে ডুবে থাকতেন। তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও ছিল খুব নিকৃষ্ট। সিরাজ আরও ছিল নির্দয়, লোভী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং সিরাজ যে তরুণ বয়সে নিষ্ঠুর, নির্দয়, লোভী ও অসৎ চরিত্রের যুবক ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নবাব আলিবর্দি তাঁকে আদরযত্ন, স্নেহ ও নানা প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ করেন। ফলে নানান স্বেচ্ছাচারিতা করেও বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দির সমর্থন ও স্নেহ বঞ্চিত তো হনইনি, পরন্তু আলিবর্দি তাঁকে নানাভাবে তোষণ করে চলতেন।

আলিবর্দি তাঁকে খুব কম বয়স থেকেই শাসনকাজে পারদর্শী করে তোলারও চেষ্টা করেন। তাঁকে অল্প বয়সেই ঢাকার নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৭৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা অভিযানের সময় আলিবর্দি তাঁকে সঙ্গে নেন। আবার ১৭৪৮ সালে সিরাজের বাবা জৈনুদ্দিন আহমেদ নিহত হলে আলিবর্দি তাঁকে বিহারের নায়িব নাজিম হিসেবে নিযুক্ত করেন আর রাজা জানকীরামকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। ১৭৪৯ সালে আলিবর্দি তাঁকে বালেশ্বরে মারাঠাদের বিতাড়ন করতে পাঠান। কিন্তু ইতিমধ্যে নবাবের এক বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ সেনাপতি মেহদি নিসারের উস্কানিতে সিরাজ রাজা জানকীরামকে বিতাড়িত করে নিজ বিহারের স্বাধীন নবাব হবার চেষ্টা করেন। সিরাজ পাটনায় পৌঁছে রাজা জানকীরামকে পাটনার দুর্গ সমর্পণ করতে আদেশ করেন। কিন্তু নবাবের বিনা অনুমতিতে সিরাজকে

এভাবে পাটনায় প্রবেশ করতে দেওয়া অনুচিত ভেবে জানকীরাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করে তাই করলেন। ফলে সিরাজের দল গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করে। পাল্টা গোলাগুলি শুরু হয়। এর ফলে বন্ধু মেহেদি নিসার খাঁ গোলাতে মারা যায়; সিরাজের যুদ্ধলিপ্সারও সাধ মিটে যায়। কিন্তু এবারও সিরাজ বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দির ক্ষমা পেয়ে যান। মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সিরাজের শৃঙ্খলাহীনতা আরও বেড়ে যায়। মুতাক্ষরিন প্রণেতা গোলাম হোসেন লিখেছেন, অসঙ্গত কামাসক্তিই সিরাজ চরিত্রের সর্বপ্রধান কলঙ্ক। গোলাম হোসেন আরও বলেছেন, "মহাত্মা আলিবর্দি খাঁর শ্রীবৃদ্ধির দশায় তাঁহার পরিবারবর্গ যেরূপ লাম্পট্য ও অনাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ভদ্র ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সিরাজদ্দৌল্লা নগরের রাজপথে ছুটোছুটি করিয়া এরূপ ঘৃণিত ও অকথ্য আচরণ করিতেন যে, লোকে দেখিলে অবাক হইত। তাঁহারা বয়স বা স্ত্রী-পুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করিত না।" সিরাজের ব্যাভিচারের বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান বা পরিসর এখানে নেই। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুরতা ও নরহত্যার অপবাদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। সিরাজের জ্যেষ্ঠতাত নোয়াজিস মহম্মদ ঢাকার নায়েব-নাজিব হলেও মারাঠা আক্রমণের সময় থেকেই তিনি ঢাকায় যাননি; মুর্শিদাবাদেই থাকতেন। তাঁর পক্ষে তাঁর দেওয়ান হোসেন কুলি খাঁ ঢাকায় শাসন করতেন আর রাজা রাজবল্লভ ছিলেন তাঁর পেশকার। কিন্তু ক্রমে হোসেন কুলি খাঁ শুধু নোয়াজিশের পক্ষে ঢাকার শাসনকর্তাই নয়, তাঁর গৃহেরও সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন। একই সঙ্গে নোয়াজিশ-পত্নী ঘসেটি বেগম এবং সিরাজের মাতা আমিনা বেগমের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমের নামে কলঙ্ক রটে যায়। সিরাজ অন্যায়ভাবে হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা করে এই কলঙ্কমোচনের প্রতিজ্ঞা করেন। সিরাজ আলিবর্দির বেগম এবং আলিবর্দির অনুমতি নিয়ে দিনের বেলায়, প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে, খণ্ড খণ্ড করে রাজপথে ফেলে দেয়। এমনকী, হোসেন কুলির অন্ধ ভাই, হায়দার কুলিকেও বিনা দোষে হত্যা করে। এছাড়া হোসেন কুলির ভাইপো হোসেন উদ্দিন খাঁকেও সিরাজের পরামর্শে হত্যা করা হয়েছিল। আবার সিরাজের জন্য মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ তৈরি হলে এর ব্যয়ভার বহন এবং সিরাজের আমোদপ্রমোদের ব্যয়ের জন্য নজরানা মনসুরগঞ্জ নামে এক নতুন আবওয়াব বা অতিরিক্ত সেস বসানো হলো জমিদার তথা প্রজাদের উপর। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দি সিরাজকে রাজ্য পরিদর্শনের জন্য হুগলী পাঠালে হুগলীর ফরাসি ও ওলন্দাজ কুঠির প্রধানেরা যুবরাজ সিরাজকে নানান উপঢৌকন দ্বারা তাঁকে সংবর্ধনা জানান। আবার কলকাতার ইংরেজরাও এ খবর শুনে নানা উপহার নিয়ে হুগলিতে উপস্থিত হয়ে সিরাজকে দান করেন। এজন্য তাঁদের খরচ হয় ১৫৫৬০ টাকা। সিরাজও ইংরেজদের শিরোপা হিসেবে হাতি দান করেন। এসব খবর জেনে নবাব আলিবর্দিও খুশি হন। সুতরাং, উপরের বিষয়গুলি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, বয়সে নবীন হলেও সিরাজ রাজকাজে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ ছিলেন না, যুদ্ধবিদ্যাও তাঁর কিছুটা জানা ছিল।

সুতরাং এহেন সিরাজ যখন আলিবর্দির উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হলেন তখন তাঁর পূর্বকৃত বিভিন্ন দুষ্কর্মের জন্য শত্রু পরিবেষ্টিত

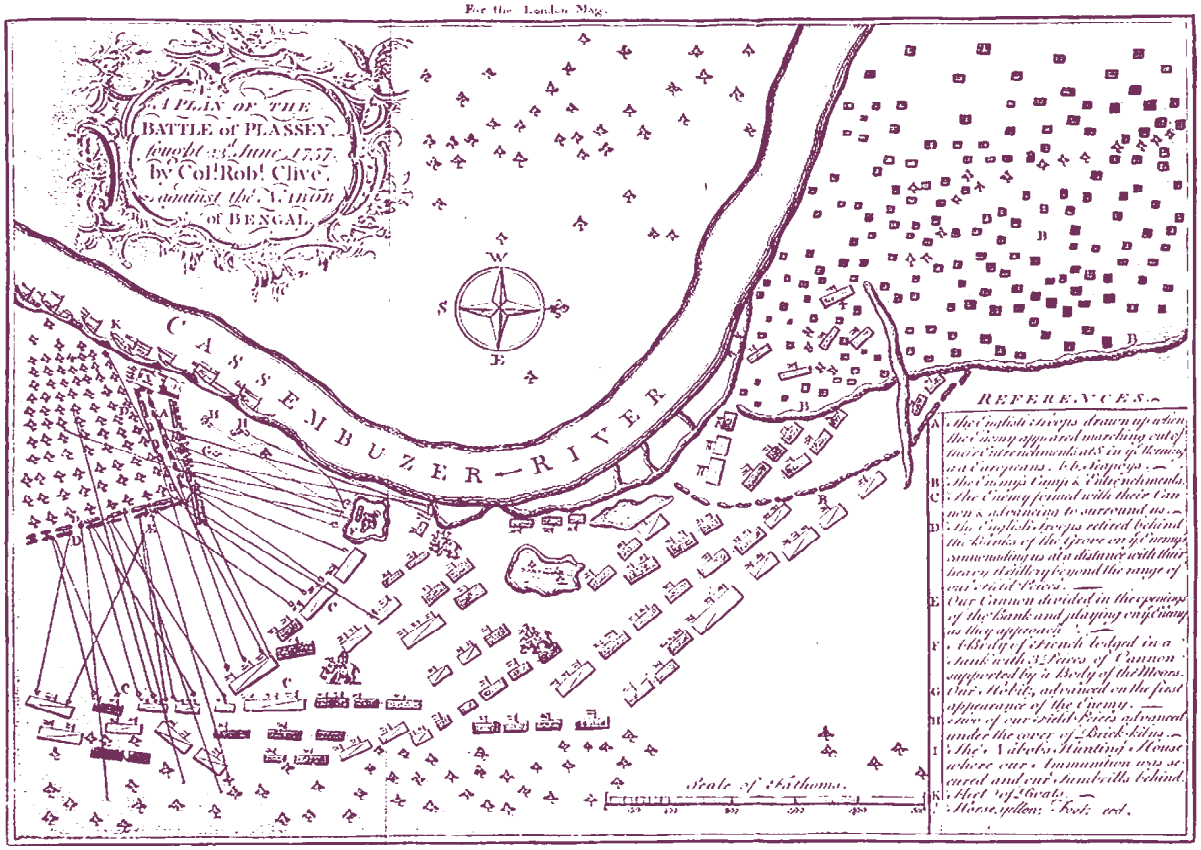

পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভ ও সিরাজের সৈন্যশিবির।

হয়েই মসনদে আরোহণ করলেন। বিভিন্ন হিন্দুগোষ্ঠী নবাবদের নানান অত্যাচার, ধর্মীয় বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি কারণে এই বিদেশাগত নবাবদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল; এর সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন নবাব সিরাজের নানা খামখেয়ালি কাজকর্ম। বিদেশি মুসলমান নবাবদের অত্যাচারে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের হাত থেকে মুক্তি চাইছিল। তাই তাঁরা এঁদের হাত থেকে মুক্ত হতে যে কোনো শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে তৈরি ছিল। নাটোরের রানি ভবানির কন্যা তারাসুন্দরী রাজশাহী-বাজুরাগ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর পত্নী ছিলেন। তিনি অপূর্বসুন্দরী ছিলেন; কিন্তু বালবিধবা। তাঁর দিকে সিরাজের লোভ ছিল। সিরাজ হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন রানি ভবানির অপূর্বসুন্দরী বালবিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে হস্তগত করার অন্যায় প্রয়াসে। যদিও সিরাজ এতে সফল হতে পারেননি। সিরাজের দাদু আলিবর্দি খাঁ কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একবার বন্দি করে রেখেছিলেন; তাই তিনিও ক্ষুব্ধ ছিলেন। সুতরাং, সিরাজ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েই সিংহাসনে বসেছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিক বলার চেষ্টা করেছেন যে সিরাজ সিংহাসনে বসার পরে নিজেকে পাল্টে নিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁদের বক্তব্য, সিরাজ তাঁর মাসি যে কিনা তাঁর সিংহাসনে বসার বিরোধী ছিলেন সেই ঘসেটি বেগমকে বুঝিয়েসুঝিয়েই বাগে আনেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, তাঁর অপর মাসি শওকত জঙ্গের সঙ্গে তাঁর আচরণ। আগে কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে আপোশমূলক নীতি গ্রহণ করলেও সিংহাসনে বসার পরে তাঁদের সঙ্গে সংঘাতের নীতিই গ্রহণ করেন; আরেক বিদেশি শক্তি ফরাসিদের সঙ্গে কিন্তু তিনি মিত্রতার নীতিই অবলম্বন করেন। তিনি ঔদ্ধত্য নিয়েই নবাবি চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। আর নবাব হওয়ার পরেও যে তিনি উগ্র মেজাজ বা নির্মম নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করেননি তারও প্রমাণ আছে তুলনায় স্বল্পজ্ঞাত এক কাহিনিতে। খুব সংক্ষেপে সেই কাহিনি ব্যক্ত করছি। সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হবার পরে প্রথমদিন দরবারে সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। কোরাণ পাঠ অন্তে সকলে তাঁকে দোয়া করলেন, আক্রোবা বা জ্ঞাতিকুটুম্বগণ তাঁকে নজরানা দিলেন। এরপরে যাঁদের সম্মানিত করা আবশ্যক তাঁদের 'খেলাত' দেবার কথা। কিন্তু এসব হবার আগেই হঠাৎ সিরাজদৌলা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ''এই ক্ষণে আমি নবাব হইয়াছি কিনা?'' সিরাজের প্রশ্ন শুনে রাজা রাজবল্লভ উত্তর দিলেন, ''অবশ্যই হইয়াছেন এবং তাহা কেবল এখন নহে, আপনার মাতামহের জীবদ্দশাতেই আমরা সকলে আপনাকে নবাব বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি।''

নবাব : আচ্ছা, তবে আমি এখন হুকুম প্রচার করিতে পারি?

দেওয়ান : তৎসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। আপনি যাহা ইচ্ছা হুকুম প্রচার করিতে পারেন।

নবাব : তবে আমার সম্মুখে আমার আতালিক (শিক্ষক) কুলি খাঁকে হাজির কর।

এর আগে সিরাজ যখন দাদু আলিবর্দির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তখন সবাই তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু যখন তাঁরা শুনল যে, ''তক্তে বসিবামাত্র, সকল কাজের পূর্বে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষককে স্মরণ করিয়াছে'' তখন ইহার প্রতি তাহাদের পূর্বসঞ্চিত কুসংস্কারগুলি দ্রবীভূত হইয়া দ্বিগুণভাবে ভক্তির উদয় হইল। সুতরাং, কুলি খাঁকে যখন ধরে আনা হলো, ফকিরেরা তাঁকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে 'ভালো হোয়' বলে দোয়া করতে লাগল। কুলি খাঁ এসে সিংহাসনের সামনে সেলাম করে দাঁড়াল। তাঁকে দেখেই সিরাজউদ্দৌলা চোখ লাল করে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কে'ও হারামজাদা! তব তুঝে ইয়াদ নেহি থা কি হাম এক রোজ ইয়ে তকতপর বৈঠেঙ্গে!' সবাই অবাক হলো, কেউ কিছুই বুঝল না। কেবল কুলি খাঁ সব বুঝল। তাঁর অন্তর কাঁপতে লাগল। মূল কথা হলো, ছাত্রাবস্থায় কুলি খাঁ ছাত্র সিরাজকে পাত্রভেদ না করে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করেছিল। অন্য ছাত্র গুরুর বেত্রাঘাত সময়ে ভুলে যায় কিন্তু সিরাজ অন্য ধাতুতে গড়া। সে ভোলেনি। তাই কুলি খাঁ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিরাজ জল্লাদ ডাকতে আদেশ করল। তবুও সকলে ভাবল, সিরাজ বুঝি খাঁকে বেত্রাঘতের জন্য ডেকেছে। কিন্তু তাঁদের ঘোর ভাঙল যখন সিরাজ চিৎকার করে জল্লাদকে বলল, 'ইস বজ্জাতকো কতল করো।' বেগতিক দেখে মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি কয়েকজন হাঁটু গেঁড়ে সিরাজকে তাঁর হুকুম প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন। এর পরের বর্ণনা আমার সাধ্যের বাইরে। খোলা দরবারে কুলি খাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো সভাসদদের সামনে। সুতরাং যে সমস্ত ঐতিহাসিকের মতে সিরাজ সিংহাসনে বসে পাল্টে যাবে তাঁরা খুব সহজেই ওই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। মাত্রই চোদ্দ বা পনেরো মাসেই সিরাজ পাল্টে গেল এট ভাবা বাতুলতা।

বলা হয়, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ হেরেছিল বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে। কিন্তু যে সমস্ত সভাসদ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তাঁদের মধ্যে যারা হিন্দু তাঁরা তো বিদেশি নবাবদের রাজত্বে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল তাঁদের নিজেদের দেশেই। তাঁরা তাই স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি, অত্যাচারী নবাবদের শাসনমুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নিজে তো বিদেশি আফসার বংশসম্ভূত, বহিরাগত নবাব। তিনি নিজে একদিকে তাঁর স্বার্থবিরোধী বলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয়েছিলেন অন্যদিকে আবার অন্য বিদেশি ফরাসিদের সাহায্য নিয়েছিলেন। সুতরাং পলাশীর লড়াইটা স্বাধীনতার জন্য নয়; দুটি বিদেশি শক্তির আধিপত্যের লড়াই। একদল আগে এসেছিল; আর অন্যদল সাম্প্রতিক। আবার নবাব সিরাজ মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক জেনেও বারবার তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে। তাঁর বাড়ি অবরোধ করেও আবার তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আনুগত্যের চুক্তি করেছে। পলাশীর যুদ্ধে মিরজাফর অংশগ্রহণ করবে না জেনেও তাঁর অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে তখন দেশপ্রেমিক মোহনলালের অনুরোধ না মেনে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের কথা শুনে যুদ্ধ বন্ধ করা এসবই সিরাজের দুর্বলচিত্ততার লক্ষণ। এই সব কারণেই ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধ জিততে পেরেছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য সিরাজ নিজেও বহুলাংশে দায়ী। আবার এই যুদ্ধে জিতলেও ফরাসি বণিকেরা প্রাধান্য পেত; ইংরেজদের বদলে ফরাসি প্রাধান্য স্থাপিত হতো। কেন জানি না, ঐতিহাসিকেরা এই দিকটি কেন এড়িয়ে যান।

সিরাজ-উদ-দৌলা স্বাধীনতা যোদ্ধা ছিলেন না কোনো ভাবেই। তিনি নিজেই ছিলেন বিদেশি; আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নির্ভর করেছিলেন আরেক বিদেশি শক্তি ফরাসিদের উপর। ■

যাদবপুরকাণ্ড এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

দিল্লির জেএনইউ এবং কলকাতার জে ইউ বহুদিন আগে থেকেই বাম, অতিবাম, উগ্রবাম, মাওবাদী, নকশালবাদী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। সারাদেশের বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পছন্দের। কারণ এখানে তারা নির্বিঘ্নে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম। তাই তাদের কাছে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বামরাজনীতির 'মক্কা'। দেশদ্রোহিতায় পাঠ নেওয়ার 'পাঠশালা'।

একদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জ্ঞানার্জনের পীঠস্থান। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের আপত্তি সত্ত্বেও অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, গোপালচন্দ্র সেন প্রমুখ। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল বিশ্বসেরাদের মধ্যে একটি। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শুরু হয় অবক্ষয়। বাম জমানায় এটি হয়ে ওঠে মাও-নকশালপন্থীদের আখড়া। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার বদলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আসক্ত হয়ে পড়ে মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওবাদী শিক্ষায়। বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়টি হয়ে ওঠে 'বামদুর্গ'। চলতে থাকে নানা অনাচার, অবিচার। অনেক অযোগ্য বামপ্রার্থীও পেয়ে যান শিক্ষকতার সুযোগ। ফলে শিক্ষায় ক্রম-অবনমনের শুরু সেই থেকে, যা আজও অব্যাহত। তাই বামমার্গী শিক্ষকদের ছত্রছায়ায় মাওবাদী-নকশালপন্থী শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে ভারতবিরোধী, দেশদ্রোহমূলক কার্যকলাপ। প্রকাশ্যে এখানেই স্লোগান ওঠে। এছাড়াও এরা প্রকাশ্যে চুম্বন করে, 'হোক কলরব' বলে, প্রকাশ্যে ধূমপান করে। চীন, রাশিয়া এদের পিতৃভূমি। আর এদেশের খেয়ে পরে মাতৃভূমিকে লাথি মারে। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী আর কাকে বলে!

১৯ সেপ্টেম্বর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। আমন্ত্রিত ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পল। কিন্তু তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতেই তাঁদের উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে একদল ছাত্রনামধারী উগ্র মাও-নকশালবাদী। বাবুল সুপ্রিয়র উপর চলতে থাকে নির্বিচারে কিল, ঘুষি, চড়। চলতে থাকে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, চুল ধরে টানাটানি। স্লোগান ওঠে, এনআরসি চাই না। ওদিকে অগ্নিমিত্রার শাড়ি নিয়ে টানাহেঁচড়া চলে। এ যেন সীতার বস্ত্রহরণ। এরা একবিংশ শতাব্দীর ছাত্রনামধারী দুঃশাসন। ছিঃ! এরা ছাত্র! যারা মাতৃজাতিকে সম্মান দিতে জানে না তারা পশু বই কিছু নয়। এরা জাতির কলঙ্ক। সমাজের লজ্জা। আসলে ছাত্র সমাজের নৈতিক অধঃপতনের শুরু কংগ্রেস আমলে। ৩৪ বছরের বাম রাজত্বে তার যথেষ্ট বাড়বৃদ্ধি হয়েছে। আর তৃণমূল শাসনে তার চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বরাবরই ছিল শাসক দলের কবজায়। তৃণমূলের শাসনে সেই আধিপত্য সর্বাত্মক। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যাদবপুরকাণ্ডে শুধু মাওবাদীরাই যুক্ত নয়, যুক্ত শাসকদলের গুন্ডারাও। কারণ তৃণমূলের প্রধান শত্রু বিজেপি। তাই মমতা সরকারের পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢোকেনি। ছিল নীরব দর্শক। বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালকে ছুটে আসতে হয়েছে ক্যাম্পাসে। ভাবা যায়? এ কোন রাজত্বে আমরা আছি! তাই মন্ত্রী নিগ্রহের দায় রাজ্য সরকারেরও। কারণ মন্ত্রীর জীবন সংশয়ের আশঙ্কা ছিল। ভুললে চলবে না, এই সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে একদা নকশালদের হাতে খুন হয়েছেন স্বয়ং এক উপাচার্য। সে এক বিরল ঘটনা। অবশ্য বামপন্থা আজ বিলুপ্তির পথে। আর বিজেপি তৃণমূলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। তাই যাদবপুর কাণ্ডে মাওবাদীদের মধ্যে তৃণমূলি গুন্ডারাও মিশে ছিল তাতে নেই কোনো সন্দেহ। কারণ তৃণমূলও এন আর সি-র বিরোধী। দেশদ্রোহিতার প্রশ্নে নীরব। তাই এরাও দেশদ্রোহী। জনৈক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন, একজন দেশদ্রোহী একজন খুনির চেয়েও বড়ো অপরাধী। বিচার হওয়া উচিত তাই তৃণমূলেরও।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

যাদবপুর কাণ্ড নিন্দনীয়

সম্প্রতি যাদবপুরে হার্মাদ বাহিনীর তাণ্ডবে অরাজকতার কথা, বাজারি পত্রিকাতে জানতে পারলাম। যদিও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়র সমালোচনাই করা হয়েছে— যেন ওখানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের অপরাধের ইন্ধন দিয়েছেন তিনি, তবে সম্পাদকীয় কলমে স্বীকার করেছেন, প্রতিবাদের ধরনটা ছাত্রসুলভ না হয়ে গুন্ডাসুলভ হয়েছে। এই ধরনের হাঁসজারু মার্কা সংবাদ পরিবেশনের কারণ ক্যামেরায় প্রকৃত ঘটনার প্রকাশ পাওয়া। একই কারণে ক্যামেরায় বহিরাগত মূল অপরাধীর ছবি প্রকাশ হতেই তার প্রতিক্রিয়া তাঁর হাতটি হঠাৎ উপর দিকে উঠে গেছে, বাকিটা সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচার। আরও একজন বলছে ও ছবি আমার নয়, কারণ আমি ওখানে বেশিক্ষণ ছিলাম না, তাই নিজ নিরাপত্তার জন্য পুলিশে আগাম অভিযোগ করেছেন— এসব এখন করছে কেন?

আসলে এরা খুবই ভীতু ও মানসিক ভাবে দুর্বল। তাই নিজেদের অপকর্মের বিষয় প্রকাশ হতে অস্থির হয়ে পড়েছে। নিজ এলাকায় কারোর সঙ্গে মেলামেশা করে না। তাই নিজ এলাকার এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া

ঘটলে সাহায্যের আশা কম। এই আত্মকেন্দ্রিক অসামাজিক ব্যক্তিরা ক্যাম্পাসে দলের সমর্থন পেয়ে হঠাৎ জঙ্গলের সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ারটার মতো আচরণ করেছে। কিন্তু অপকর্মের ছবি প্রকাশ হতেই ভয়ে বিড়াল হয়ে গেছে। প্রতিবাদ কখনও হঠকারী গুন্ডামি হতে পারে না। তাই এ ছবি দেখে প্রতিবাদীরা বা সাধারণ মানুষ কখনই সমর্থন করতে পারবে না। যদিও হামলাকারীরা নিজেরা অত্যাচারিত বলেই ধিক্কার মিছিল করেছে। কিছু মিডিয়ার ও রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবীদের পেশাদার অভিনেতারা ঘটনার বিকৃত করে এদের সমর্থনে তরজা শুরু করেছে। আত্মপ্রচার, সুবিধালোভী, বিশেষ গোষ্ঠীর মতাদর্শের মদতদাতাদের নিকট সত্য-মিথ্যার বিষয়টি খুবই গৌণ।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলি।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি কি অবশ্যম্ভাবী?

ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেই সবজিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা কেউই আর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে বাংলা বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারছে না। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বাংলা ভাষার অবলুপ্তি কি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা? বর্তমানে অনেক বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙেয়ের ছাতার মতো একের পর এক গজিয়ে উঠছে নার্সারি আর কিন্ডারগার্টেন স্কুল। বর্তমানে অবস্থা এমন হয়েছে যে খবরের কাগজের হকার বা বাড়িতে কাজের বউরাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের মিশনারি স্কুল নিদেনপক্ষে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতে না পারলে কিছুটা হীনম্মন্যতায় ভোগে।

তাই ছোটোরা অ অজগর আসছে তেড়ে বা আ আমটি আমি খাব পেড়ে এসব আর শেখে না বা 'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে' এসব আজকাল উঠে গেছে। ছোটোরা এখন শেখে রাইমস্ 'টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল লিটিল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর...।' টিভির বিভিন্ন ধারাবাহিকে ছোটোদের গোরু, বাঘ বা সিংহ দেখিয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা বলবে কাউ, টাইগার বা লায়ন। কারণ ছোটোরা সেগুলোই শিখেছে বা তাদের সেগুলোই শেখানো হয়েছে। উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারেও অনেককেই এখন মা বাবা, মাসি, পিসি প্রভৃতি সম্বোধন করতে শোনা যায় না। মা হয়েছে এখন মম্ বাবা হয়েছে ড্যাড, বাকি সবাই আঙ্কেল বা আন্টি। ছোটো বড়ো সবাই হাই, বাই, টাটা ইত্যাদিতে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। হ্যালো, থ্যাঙ্ক ইউ, ওয়েলকাম ইত্যাদি তো বর্তমানে অতি অবশ্য পালনীয়। জন্মদিনে কেক কাটা, ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভনো এবং 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' গান তো হবেই। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ তো আজকাল বাংলাই হয়ে গেছে যেমন টেবিল, চেয়ার স্কুল, কলেজ, পেনসিল রবার, কাপ, ডিশ ম্যাচ প্রভৃতি। অবশ্য বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেক শব্দেরই বাংলা নামকরণ এখনো হয়ইনি। সুতরাং সেগুলি তো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেই হবে। আর পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত সেলিব্রেটিরা প্রয়োজনে তো বটেই নিষ্প্রয়োজনেও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে না পরলে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। আর কথায় কথায় শেয়ার করা, মিস করা বা টাটা বাই তো বর্তমানে কথার মাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাদার,
চন্দননগর।

অনৈতিক রাজনীতি

সাতের দশকে যখন দেশের রাজনীতির অঙ্গন থেকে কংগ্রেসের মুষ্টি অলগা হচ্ছে অনৈতিক রাজনীতির যাত্রার শুরু সেই থেকে। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও কংগ্রেসের পরিষ্কার বাইরে থাকা রাজনীতির মূলস্রোতের বিরোধী নেতৃবর্গ ক্ষমতার বাইরেই থেকেছেন। ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের মোক্ষম সুযোগ এল ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার সময়। ইন্দির গান্ধীর বিরোধী মুখ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এক ছত্রতলে এলেন তামাম বিরোধী নেতারা। লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। বলা যায় সেটা ছিল একরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বেশিদিন টেকেনি সেই জোট। বরং একে বলা ভালো রাজনৈতিক 'ডাট'। কিন্তু সে সময়ে একটা জিনিস ছিল লক্ষ্য করার মতো। কোনও দলই তাদের মতাদর্শ জলাঞ্জলি দেয়নি। পূর্বতন জনসঙ্ঘ জনতা দলে মিশলেও তাদের হিন্দুত্ব নীতি থেকে সরে আসেনি। বামেরা তাদের নীতি বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু এইসব রাজনীতিকদের চেনা গেল সেদিন যেদিন জনতা জনার্দন নির্দিষ্ট কোনও দলকেই শাসন চালাবার অনুমতি দিল না। ফলে আবার জোট বা 'জটের' রাজনীতি। যে জ্যোতিবাবু নিজেকে সাচ্চা কমিউনিস্ট বলে দাবি করতেন। তিনি অতি ডানেদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু বামেরা তা হতে দেননি।

ইদানীং এ রাজ্যের কংগ্রেস ঘোষণা করেই ছিল যে, সিপিএম ছাড়া তারা এ রাজ্যে ব্রাত্য হয়ে যাবে। অথচ অতীতে ইন্দিরা কংগ্রেস স্বস্তিতে রাজত্ব করতে দেয়নি সিপিএম পরিচালিত যুক্তফ্রন্টকে। সংসদের অন্দরে সিপিএম নেতা জ্যোতির্ময় বসু ত্রস্ত করে রাখতেন ইন্দিরা গান্ধীকে। এ রাজ্যেই আবার বিজেপির রথ ঠেকাতে মমতার ঘোষিত শত্রু বামেদেরও আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে লড়তে। অন্যত্র মোদী ২.০-এ বিপুল জয়ের পর হরিয়ানায় বিজেপি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পেয়ে দুষ্মন্ত চৌতালার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে সরকার গড়তে।

—অনুপ্রিয়া সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

নিজের মেয়েকেই লক্ষ্মীরূপে পূজা

মাটির প্রতিমা কিংবা সরা নয়, নিজের মেয়েকেই লক্ষ্মীরূপে পূজা করলেন গৃহস্বামী গত কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমায়। ঠাকুরঘর। মাঝখানে কাঠের সিংহাসন। তার সামনে একটি পিঁড়ির ওপর বসে আছে মা লক্ষ্মী। পরনে লাল বেনারসি। গয়নার সামান্য সাজ। গলায় ফুলের মালা। এক হাতে পদ্ম, অন্য হাতে শক্ত করে ধরা একটি ঝাঁপি। পুজো করতে এসে ঠাকুরঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন পুরুতমশাই। মৃন্ময়ী প্রতিমা তো নয়, এ যে সাক্ষাৎ মায়ের চিন্ময়ী রূপ। সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি। শান্ত ফুটফুটে মুখের কোণে হাসি। মন্ত্র পড়তে পড়তেই পুরুতমশাই বসলেন আসনে। বেজে উঠল কাঁসর ঘণ্টা। আলতা মাখানো হাতে বরাভয় দেখাল মা লক্ষ্মী।

মেয়ের নাম রূপকথা। বাড়ির আদরের বড়ো মেয়ে। বয়স মাত্র পাঁচ। নদীয়া জেলার মাজদিয়ার 'শিব নিবাস' বাড়িতে সেই জ্যান্ত লক্ষ্মী। মাটির প্রতিমা নয়, নিজের মেয়েকেই পূজা করলেন মা ঝুমাশ্রী খাঁ বিশ্বাস। মেয়েকে লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে পেরে তিনি গর্বিত। বললেন, মেয়ের জন্ম হলে সবাই বলে ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। নারীই তো শক্তি। মেয়েরাই তো দেবী। তাই স্নেহে আদরে নিষ্ঠায় পূজা করছি আমার জীবন্ত প্রতিমাকে। ওই তো আমাদের মা লক্ষ্মী।

রূপকথা আর সাঁঝবাতি। ঝুমাশ্রী দেবীর দুই মেয়ে। সাঁঝবাতির বয়স এখন এক বছর। পিঁড়িতে অত সময় বসে থাকতে পারবে না। বড়ো হলে ওকেও দেবীরূপে পূজা করবেন তিনি। স্বামী রমেশ খাঁ বিশ্বাস শক্তিনগর হাই স্কুলের শিক্ষক। বললেন, মেয়েকে লক্ষ্মীরূপে পুজোর ইচ্ছাটা তাদের দুজনেরই। ঘরের সুখ সম্পদের মূল তো মেয়েরাই। মানুষের মধ্যেই তো ঈশ্বরের বাস। আর মেয়েরা তো শক্তিরূপিনী। জীবন্ত প্রতিমা। মৃন্ময়ী মূর্তির পাশাপাশি মানব-মানবীকেও দেব-দেবী জ্ঞানে পুজো করার রীতি বহুকাল ধরেই আমাদের দেশে চলে আসছে। কুমারী পুজো হলো দেহমন্দিরে বাস করা শুদ্ধাত্মার পুজো। কুমারী অর্থাৎ অরজঃস্বলা কন্যার পুজোই এর বিধান। তাকেই মাতৃজ্ঞানে পুজো করা হয়। শাস্ত্রের মত হচ্ছে, কুমারী মেয়েকেই দেবীর আসনে বসাতে হয়।

ঝুমাশ্রী দেবী বললেন, 'কন্যা সন্তান মানেই ব্রাত্য নয়। সংবাদপত্র কিংবা টিভি খুললেই দেখা যায় দেশের নানা জায়গায় অবলীলায় চলছে কন্যাভ্রূণ হত্যা। মেয়ের জন্ম দিয়েছেন যে মা তাকে চূড়ান্ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে, যেন মেয়ের জন্ম দিয়ে ওই মা বিরাট অপরাধ করে ফেলেছেন। মেয়েরা যে আসলে বাবা-মায়ের গর্ব নিজের মেয়েকে পুজো করে সেটাই বোঝাতে চেয়েছি।'

কুমারী পুজোর মতো নিয়ম মেনেই মায়ের বরণ, অঞ্জলি সব কিছু হয়েছে। এতদিন বাড়ি বাড়ি মাটির প্রতিমা পুজো করে এসেছেন যে পুরোহিত তাঁর মুখেও দেখা গেছে প্রসন্নতার হাসি। এই প্রতিমা বড়োই সরল, বড়োই সুন্দর। তাকে আবাহন করতে হয় না। ডাকলেই সে মিষ্টি গলায় সাড়া দেয়। পুজোর আসনে যেন কোজাগরী জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েও নারীশক্তির জয় নিয়ে আস্ফালন করতে চাননি ঝুমাশ্রীদেবী ও রমেশবাবু। পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্রের মধ্যে কলহ-বিবাদে অবতীর্ণ হতে চাননি তাঁরা। নদীয়ার এই ছাপোষা পরিবার জীবন্ত লক্ষ্মীপুজোর মধ্যে দিয়ে এক অনাবিল মাতৃস্নেহের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। নাড়ি ছিঁড়ে যে কন্যার জন্ম হচ্ছে তাকে গর্ভেই মেরে ফেলার মধ্যে কোনো অপরাধ দেখে না সমাজের অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা অংশ।

লিঙ্গ বিচার করে আমাদের দেশে আজও গর্ভপাত হয়ে চলেছে। 'বেটি' বাঁচাতে কতই না সরকারি ঢাকঢোল, আড়ম্বর। তাতে কাজের কাজ কতখানি হয়, কন্যাভ্রূণ হত্যা নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষাই তার প্রমাণ। ঝুমাশ্রীদেবী-রমেশবাবু মনে করেন, চিন্তার বিবর্তনটা নিজের বাড়ি থেকেই শুরু হওয়া উচিত। পরিচিত ঘেরাটোপে পরিবারের মধ্যেই সম্মান পেতে অভ্যস্ত হোক দেশের মেয়েরা। মাজদিয়ার বিশ্বাস পরিবার চেয়েছে, নিজের নিজের ঘর থেকেই ব্যতিক্রমী ভাবনার দৃষ্টান্ত তৈরি হোক।

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)

মলদ্বারে ব্যথা ও রক্তক্ষরণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মলদ্বারে দেওয়ালে পাতলা প্রথম আস্তরণ ফেটে বা ছিঁড়ে যখন ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেই ক্ষতকে অ্যানাল ফিশার বলা হয়ে থাকে। মলত্যাগের সময় যখন শক্ত অথবা বড় আকারের মল পায়ুপথে বেরিয়ে আসে তখন ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে অ্যানাল ফিশারের সূচনা করে। পায়ুপথে মলত্যাগের ব্যথা এবং রক্তক্ষরণ অ্যানাল ফিশারের প্রধান উৎসর্গ। এছাড়াও অ্যানাল ফিশার হলে মলদ্বারে যে মাংসপেশি (অ্যানাল বা মলদ্বার স্ফিংটার) থাকে সেই পেশির ব্যথাযুক্ত সংকোচন অনুভূত হতে পারে। সচরাচর ছোটো শিশুর অ্যানাল ফিশার হলেও যে কোনো বয়সেই অ্যানাল ফিশার হতে পারে। মধ্য বয়সেও অ্যানাল ফিশার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। বেশিরভাগ অ্যানাল ফিশার সহজ সাধারণ চিকিৎসার মাধ্যমেই ভালো করা সম্ভব যেমন বেশি করে শাকসবজি, ফলমূল খাওয়া, যোগব্যায়াম করা, অধিক পরিমাণে জল পান করা ইত্যাদি। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধ অথবা সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে। প্রধান উপসর্গ মলমূত্র ত্যাগের সময় ব্যথা এবং সেই ব্যথা অনেক সময় মারাত্মক ও অসহনীয়। ব্যথা মলত্যাগের পরে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। মলের সঙ্গে তাজা রক্ত দেখা যায় অথবা মলত্যাগ করার পর টয়লেট পেপারে রক্ত দেখা যেতে পারে। পায়ুপথে ঘা অনুভব করাও যায়। এবং বেশ কিছুদিন থাকার পর ওই ত্বক ঘায়ের নীচে কিছুটা পর্যন্ত ফেটে গিয়ে চামড়ার ছোটো একটা পিণ্ড সৃষ্টি হয় যার আলংকারিক নাম 'পাইলস প্রহরী' অর্থাৎ যেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো শতভাগ সময় ক্ষতটা পাহারা দেয়।

সচরাচর শক্ত অথবা বিশাল আকারের মলত্যাগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, দীর্ঘস্থায়ী পাতলা পায়খানা অ্যানাল ফিশার সৃষ্টি করে। মাঝে মধ্যে ক্রোনস অথবা অন্ত্রের অন্যান্য প্রদাহ, পায়ুপথের ক্যান্সার, এডস, সিফিলিস এবং টিবির কারণে অ্যানাল ফিসারের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য, মলত্যাগের সময় বেশি চাপ প্রদান, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, অন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদি অ্যানাল ফিসার সৃষ্টির আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

জটিলতা হিসাবে এবাল ফিশার ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ফিশার যদি ৮ সপ্তাহের বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে সেই ফিশারকে ক্রনিক ফিশার হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ক্রনিক ফিশার সাধারণ মাংসপেশি বা স্ফিংটার পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে সার্জারি ছাড়া আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। অ্যানাল ফিশার একবার হলে বারবার হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। পায়ুপথে অ্যানাল ফিশারের অবস্থান ফিশার হওয়ার কারণ নির্দেশনা করতে পারে। পায়ুপথের সামনে অথবা পেছনদিকে না হয়ে ফিশারের পার্শ্বস্থানে অবস্থান সাধারণত ক্রোনস, টিবি, সিফিলিস ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপন অ্যানাল ফিশার প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত শাকসবজি খাওয়া, প্রচুর জলপান এবং নিয়মিত হাঁটাচলা, ব্যায়াম শুধু সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তাই করে না, অ্যানাল ফিশার-সহ দেহের অন্য সব মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মোদ্দা কথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, দীর্ঘস্থায়ী পাতলা পায়খানা পরিহার করে নিয়মিত ও সঠিক মলত্যাগ করা স্বাস্থ্যহানি প্রতিরোধে অত্যাবশ্যকীয়। অ্যানাল ফিশারের চিকিৎসার জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। চিকিৎসক সাধারণত রোগীর ইতিহাস জেনে সাবধানে পায়ুপথটা পর্যবেক্ষণ করবেন। সাধারণত ফিশার সহজে অবলোকন করা যায়। যদি স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা পরিচালনায় উপকার হয় তবে চিকিৎসক চিকিৎসা শুরু করেন। উপসর্গ ও ফিশার ভালো না হওয়ার কারণ হচ্ছে, যে মুহূর্তে পায়ুপথ ছিঁড়ে যায়, সে মুহূর্তে মলদ্বারে মাংসপেশি (অ্যানাল বা মলদ্বার স্ফিংটার) সেই ব্যথাযুক্ত সংকোচন হয় এবং সেই সংকোচন প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাপনার ওপর। পেশি সংকোচন বন্ধ করে পেশির শিথিলতা নিশ্চিত করতে পারলে ফিশার ভালো হওয়া শুরু করে।

পেশির শিথিলতার জন্য ব্যবহার করা হয় নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ যা হৃৎপিণ্ডের ব্যথা এনজাইম রোধে ব্যবহার করা হয়। ওই ওষুধ হৃৎপিণ্ডের পেশির মতো পায়ুপথের পেশিকে শিথিল করে ফিশার নিরাময়ে সাহায্য করে। বটুলিনাম টক্সিন পায়ুপথের স্নায়ুকে অবশ করে মাংসপেশি শিথিল করে এবং সার্জারির মাধ্যমে ল্যাটারাল স্ফিংটারোটমি ও একই ভাবে স্থায়ীভাবে অ্যানাল মলদ্বার স্ফিংটার শিথিল করে, সে কারণে অপারেশন করলে ফিশার দ্রুত ও স্থায়ী আরোগ্য সম্ভব হয়। ক্রনিক ফিশারের জন্যই সার্জারিই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিবেচিত হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

অনেক সময় অপারেশনের পরেও সমস্যার সমাধান হয় না। এরকম আমাদের কাছে প্রচুর রোগী আসে। মলদ্বারের রক্ত ক্ষরণের সে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করে সুফল পাই সেগুলি হলো– ব্লুমিয়া ওডো, হ্যামামেলিস স্যাঙ্গুইসিয়া প্রভৃতি।

মলদ্বারে ব্যথাতে অ্যাসিড নাইট্রিক, ম্যাগমিউর, ব্যাটানিকা প্রভৃতি ভালো কাজ করে। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ■

বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও উপদেষ্টার মন্তব্য দুদেশের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ অসমের গুয়াহাটিতে বাণিজ্য ও যোগাযোগ নিয়ে 'ভারত-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডারস মিট'-এ যোগ দিতে গিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান গণমাধ্যমে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন দুদেশ সম্পর্কের নতুন শিখরে পৌঁছেছে তখন এমন মন্তব্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেছেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন হয় না। তারা বাংলাদেশে সুরক্ষিত। বরং ভারতে মুসলমানরা অসুরক্ষিত। এখানে মুসলমানরা নির্যাতনের শিকার হয়। ভারতের অসমের প্রভাবশালী বেসরকারি টিভি চ্যানেল প্রতিদিন টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি। টিপু মুন্সি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হয় না। গোমাংস খাওয়া নিয়ে ভারতে মুসলমানরা নির্যাতনের শিকার হন। ভারতের উত্তর অংশে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। দৈনিক একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের মন্ত্রী আরও বলেছেন, অসমে নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বাংলাদেশ ততটা চিন্তিত নয়, কিন্তু চিন্তিত দেশের বিভিন্ন অংশে গোমাংস ভক্ষণের নামে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে। অসমে প্রব্রজনকারীদের যেভাবে বাংলাদেশি বলে তাচ্ছিল্য করা হয়, সেটা নিয়েও বাংলাদেশ চিন্তিত। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতের এই অঙ্গরাজ্যের জমিতে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সির দাবি, বাংলাদেশে হিন্দুরা পুরোপুরি সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু, সর্বত্র না হলেও ভারতের কিছু কিছু স্থানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চলছে। গোমাংসের নামে নির্যাতন করা হচ্ছে মুসলমানদের। টিপু মুন্সি সাংবাদিকদের বলেন, আপনাদের দেশ থেকে কী খবর পাচ্ছি আমরা। ভারতে মুসলমানরা নিরাপদ নন। সর্বত্র না হলেও কিছু কিছু স্থানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। উত্তর ভারতের নানা স্থানে ওই ধরনের ঘটনা ঘটছে। গোমাংস খাওয়া নিয়ে নির্যাতন হয়। মুসলমানদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয়। আসলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও সেটাকে বড়ো করে দেখানো হয়। কিন্তু মন্ত্রীর দাবি, সেটা

মোটেই হিন্দু নির্যাতন নয়। অবশ্য অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ মন্ত্রী বলেন, নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নবীকরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বলেছেন, সেটাই আমরা বলব। আমরা মোটেই চিন্তিত নই। ভারতের এক রাজ্যে নাগরিকপঞ্জি নবীকরণ হচ্ছে, সেটো নিয়ে আমরা কেন চিন্তিত হব?

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মশিউর রহমান বলেছেন, প্রব্রজনকে (দেশান্তরিত) মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিবেচনা করতে হবে। একজন মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা এবং মানুষের মতোই আচরণ করা উচিত। বাংলাদেশি, মিজো ইত্যাদি হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। কে কোথা থেকে এসেছে, সেটা ভুলে গিয়ে মানুষ হিসাবেই গণ্য করা উচিত। মশিউর রহমান আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে অসমে মোটেই দেশান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটছে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি দেখেন, সেটা বুঝবেন। অনেক কাল আগে বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরিত হতো, এখন আর হয় না। অর্থনীতিকরা বলছেন, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত। তাই কেউ ভালো অবস্থায় থাকলে, অর্থনীতি ভালো হলে কেন ভারতে আসবেন? তাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সেটা সত্য নয়। মশিউর রহমান সীমান্ত নিয়ে আরও উদার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছে র‍্যাডক্লিফ লাইনে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ লাইন পুরনো হয়েছে। র‍্যাডক্লিফকে এখন বিদায় জানানো উচিত।

গত ২২ ও ২৩ অক্টোবর অসমের গুয়াহাটিতে দু'দিনব্যাপী ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি ও প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তরা। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের সাথে ভারতের উত্তর পূর্ব ৮টি রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে টাস্ক ফোর্স গঠনের একমত হয়েছেন দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ মন্ত্রী ও উপদেষ্টার মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ঢাকায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এই প্রতিনিধিকে বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুরা যদি সুরক্ষিত থাকতো, তাহলে গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শাসকদল আওয়ামি লিগের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি কেন দেওয়া হয়েছিল? বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে ১৯৪৭ সাল থেকে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত ছিল না, বরং লক্ষ কোটি হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যালঘুরা কেন দেশত্যাগ করছে? শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনসংখ্যার হিসেব দেখলেই তাতে স্পষ্টতই বিষয়টি প্রতিভাত হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল সংখ্যালঘু। ২০১১ সালে সেন্সার রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যালঘু জনসংখ্যার ৯ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এল কেন? ■

বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত বলা সত্যের অপলাপ মাত্র

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গত ২৩ অক্টোবর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য শেখ হাসিনা সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা অসমে এসে যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন আর নিজেদের পাপ ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তা হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। যেখানে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সির দাবি, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা পুরোপুরি সুরক্ষিত রয়েছেন'। কিন্তু সর্বত্র না হলেও ভারতের কিছু কিছু স্থানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চলছে। তিনি আরও বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ আমাদের দেশ। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি রয়েছে। হাজার হাজার দুর্গাপুজো হচ্ছে প্রতিবছর। আমাদের লোকসভা কেন্দ্র রংপুরে এবার ১৫৬টি দুর্গাপূজা হয়েছে, আমি মণ্ডপে গিয়ে আনন্দ করেছি। গভীর রাত অবধি নাড়ু খেয়ে ঘুরছেন সকলে।

হাসিনার আর্থিক বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান দাবি করেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি উল্লেখযোগ্য। তবে সমাজে দু-একজন বদ মানুষ সব খানেই থাকে, তার জন্য গোটা দেশ বা জাতিকে বদনাম করা যায় না।' বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের মুসলমানরা নিরাপদ নন। সর্বত্র না হলেও কিছু কিছু স্থানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। উত্তর ভারতের নানা স্থানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। গোমাংস খাওয়া নিয়ে নির্যাতন করা হয় মুসলমানদের, 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে খালেদা জিয়ার শাসনকালে যে নারকীয় অত্যাচার হিন্দুদের ওপর হয়েছে সেকথা বাদ রেখেও শুধু শেখ হাসিনা সরকারের আমলে হিন্দুদের ওপর যেরকম অত্যাচার চলছে সেগুলি আলোচনায় আনলে টিপু মুন্সি, মশিউর রহমানদের দাবি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতোই ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। মশিউর রহমানের দাবি মতো—'সমাজে দু-একজন বদ মানুষ সবস্থানেই থাকে, তারজন্য গোটা দেশ বা জাতিকে বদনাম করা যায় না' তাহলে তাঁর কথামতো ভারতে কি দু-একজন বদ মানুষ নেই? যদি থেকে থাকে তার জন্যে কি সমগ্র ভারত এবং হিন্দুসমাজকে দোষ দেওয়া যায়? তবে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে একটা তফাত আছে। তা হলো ভারতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ হলে দুস্কৃতীদের শাস্তি হয়। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে গুন্ডাদের শাস্তি হয় না। আর বাংলাদেশে হাজার হাজার দুর্গাপূজো হলেও প্রতিমা গড়ার শুরু থেকে পূজো শেষ হওয়া অবধি বহুস্থানে মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে পূজো বন্ধ করে দেয় গুন্ডারা। সেকথা কিন্তু তাদের বক্তব্যেই উঠে আসেনি। ভারতের মুসলমানরা নিরাপদ নন এই কথার প্রেক্ষিতে বলা যায়—ভারতে মুসলমানরা যতটা নিরাপদ ততটা নিরাপদ বিশ্বে আর কোনো দেশে তারা নন এমনকী কতকগুলি মুসলমান দেশেও নয়। চীনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন সেখানে মুসলমানরা কী অবস্থায় আছেন।

টিপু মুন্সী

মশিউর রহমান

যাই হোক, ২০০৮ থেকে হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর (তবে সব জায়গায় নয়, অনেক জায়গায়) যেরূপ সরকারি সন্ত্রাস নেমে এসেছে এবং গুন্ডাদের অত্যাচার বেড়ে গেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। অসম থেকে ১৬ জন বিএসএফ কর্মীকে টেনে নিয়ে গিয়ে গণহত্যা, লিগ নেতা মন্ত্রী কর্তৃক টাঙ্গাইলে দেড় কোটি টাকার হিন্দু সম্পত্তি দখল, নাবালিকা রাধারানি কিংবা বিবাহের পূর্বেই দুবৃত্তদের মৌলি গাঙ্গুলির অপহরণ, ইসকন মন্দিরে ওসি হামালা, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সম্পত্তি আত্মসাৎ, রমনা কালীবাড়ি জবরদখল, প্রকাশ্যে মন্দিরের পূজারি হত্যা, শ্মশান দখল, রামকৃষ্ণ মিশন আক্রমণ, বিশ্বজিৎ হত্যা, সুরজিৎ সেনগুপ্ত অবমাননা, খুন, গণহত্যা, ধর্মান্তরকরণ-সহ দীর্ঘ কালো তালিকার কোনও বিচার হয়নি হাসিনা সরকারের আমলে।

২০১৬ সালে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ধ্রুবেশ্বরানন্দ মহারাজ মুসলমান মৌলবাদীদের হুমকিতে খুন হওয়ার ভয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় পালিয়ে এলেন। বাংলাদেশে হিন্দুরা কত সুখে আছে তার একটা নজির তুলে দেওয়া হোলো। মাত্র কয়েকমাস আগে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নেতা আইনজীবী পলাশ রায়কে থানার ভেতরে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। গত ৩০ মার্চ দুপুর ১২.৪০ মিনিটে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে সুব্রত দাস-সহ আরও পাঁচটি হিন্দুর দোকান দখল করে প্রভাবশালী মুসলমানরা তাদের দেশছাড়ার নির্দেশ দেয়, অন্যথায় খুনের হুমকি দিয়ে যায়। সিলেটের গোপালগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা করে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং ভাঙচুর চালায়। চলতি বছরে চট্টগ্রামে তিথি ও তার মাকে স্থানীয় মেম্বারের ছেলে ও তাঁর দলবল মিলে গভীর রাতে ঘরে ঢুকে টানা চারবার গণধর্ষণ করে। নাটোর জেলার লালপুর থানার গোপালপুর গ্রামে দুপুর আড়াইটা নাগাদ এক পুরোহিতকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

গত ১৬ জুলাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়া সাহা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থার বর্ণনা করে বলেছেন—"Sir I am from Bangladesh.... 37 million Hindus, Buddhist and Christians are disappeared. Please help us..... for the Bangladeshi minority people. We wnat to

stay in our country. My request is please help us, we don't want to leave our country, just help us to stay. I have lost my home, they have 'burnt my house, occupied my land, but no judgement yet taken, Please help.....'' অর্থাৎ—মহাশয়, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি..... ৩৭০ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করুন..... বাংলাদেশি সংখ্যালঘু জনগণকে। আমরা আমাদের দেশে বসবাস করতে চাই। আমার অনুরোধ, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন, আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করতে চাই না, কেবলমাত্র থাকার জন্য সাহায্য করুন। আমি আমার বাড়ি হারিয়েছি, তারা আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, সম্পত্তি দখল করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও সুবিচার পাইনি, দয়া করে সাহায্য করুন.....।

প্রিয়া সাহার বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের সাহিত্যিক, পরিচালক এবং Weekly Bliting পত্রিকার সম্পাদক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর কথা থেকে। তিনি ১২ জানুয়ারি ২০১১তে ওয়াশিংটনে বাংলা রেডিয়োতে এক খোলামেলা সাক্ষাৎকারে বলেন, A Secular Govt. come to power in the year 2008, but things didn't change much in Bangladesh. Every year almost sixteen thousand Hindu women in Bangladesh are kidnapped and converted to Islam forcefully. The numbers have not changed in the year 2011. অর্থাৎ ২০০৮ সালে বাংলাদেশে সেকুলার সরকার ক্ষমতায় এলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ অবস্থার বাস্তবিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১৬ হাজার হিন্দু মহিলা অপহৃত হয় এবং বাধ্য হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। ২০১১তে এসেও এই সংখ্যা কমেনি মোটেও।

প্রিয়া সাহা এবং সালাউদ্দিন সাহেবের কথার সমর্থন মেলে সেখানকার এক অধ্যাপকের কথায়। সাম্প্রতিক অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বরকত সাহেব তাঁর চাঞ্চল্যকর গবেষণায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হিন্দুদের প্রায় ২৬ লক্ষ একর জমি জবরদখল করা হয়েছে, আর যেভাবে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে গড়ে প্রত্যহ প্রায় ৬৩০ জন হিন্দু দেশত্যাগ করছে তাতে আগামী কুড়ি বছরে হিন্দু শব্দটি বাংলাদেশ থেকে চিরতরে মুছে যাবে।

প্রিয়া সাহার অভিযোগের আগে বাংলাদেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার একটি মামলার রায়

ভাঙা হয়েছে কালীমূর্তি।

সরকারের বিপক্ষে যাওয়ায় তাঁকে নিজ দেশেই সরকারি নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়ে অন্য দেশে শরণার্থীর আশ্রয় ভিক্ষা করতে হচ্ছে। একজন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির যদি এই হাল হয়, তাহলে সাধারণ হিন্দুদের কোনো বিচার পাওয়ার আশা করা যায় কি?

এবারে দেখা যাক বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলি কী লিখছে। ১। 'প্রথম আলো'---১৩ জানুয়ারি ২০১৭তে লিখেছে---'বাংলাদেশ সংখ্যালঘু পরিস্থিতি ২০১৬' শীর্ষক প্রকাশ করে জানায়—২০১৬ সালে ২০১৫ এর তুলনায় সাড়ে পাঁচগুণেরও বেশি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। ২০১৬ তে ৭১ জন সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হয়েছে, ১২৪ জনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়, ৭৭টি হিন্দু মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হন ৩২ জন।

২। অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুসারে ২০১৮তে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৮০৬টি, হত্যা ১০ জন, প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন ১৭ জন, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ৮ জন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি লুঠ ও উচ্ছেদের সংখ্যা ১৯৩টি, দেশত্যাগের হুমকি ১৭ জনকে, ধর্মান্তরকরণ ১০৪ জনকে, মঠ-মন্দিরে হামলা ৭২টি। এছাড়া খবরের বাইরে থাকা ঘটনা যে কত ঘটছে তার হিসাব পাওয়া মুশকিল।

কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ। তা কমতে কমতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ১৯ শতাংশে নেমে আসে। সেই সংখ্যা কমে এখন হয়েছে ৮ শতাংশ। তাহলে বাংলাদেশ যদি সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হয় এবং হিন্দুরা নিরাপদে থাকে তবে ১১ শতাংশ হিন্দু কোথায় গেল—টিপু মুন্সি, মশিউর রহমান সাহেবরা সে উত্তর দেবেন কি? এই সংখ্যাতাত্ত্বিক পাটিগণিত থেকে সহজেই বোঝা যায় বাংলাদেশে চলছে হিন্দু বিতাড়নের ধারাবাহিকতা---শত্রু সম্পত্তি আইন পরবর্তীকালে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' বলে ভূমি লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া সে দেশে এখনও বলবৎ। অনেকদিন আগে একবার ভারত-বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। সেই খেলায় জিতেছিল ভারত। ক্যাপ্টেন ছিলেন আজাহারউদ্দিন। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনা। তিনি টিভির সাক্ষাৎকারে ক্রিকেটের ফলাফল বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সবই ভালো লাগছে কিন্তু একটা হিন্দুর হাতে পুরস্কার তুলে দিতে হচ্ছে এটাই খুব খারাপ লাগছে।' একটা দেশের প্রধানের কি মধুর বচন তাই না? এই হাসিনার আমলে ডব্লুবিসিএস পাশ একটা হিন্দু ছেলেকে একটা অফিস থেকে বলা হয়েছিল, ''চাকরি? ভারতে পালা, এখানে তোর কী?'' এক জনপ্রিয় সংবাদপত্রের খবর।

অধুনা বাংলাদেশে আর সোনার বাংলার ছাপ নেই, ছায়া নেই। সোনার বাংলা মরে গেছে। সেই মাটি রয়েছে ঠিকই, সেই নীল আকাশে চিলও উড়ছে, সবুজ বনানীতে চারিদিক ছায়া ঢাকা, শ্যামল শস্যক্ষেতের উপর সবুজের ঢেউ খেলছে আগের মতোই। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জলেও ছলছলাৎ ঢেউ উঠছে, যেমন উঠত সেই সুদূর অতীতে। কিন্তু বাংলাদেশিদের ভাটিয়ালি মন ও ভাওয়াইয়া বিবেকে পচন ধরেছে। লোভলালসা ও কামকামনার কুপ্রবৃত্তি মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নোংরা করে দিয়েছে। তার মাঝে গুটিকয় লোকের রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যনাট্য সে পচন রোধে ব্যর্থ। বাংলাদেশের এই পরিণতি অবধারিত ছিল। কাজেই নিশ্চিত বলা যায় বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত নন, বরং ভারতে মুসলমানরা সুরক্ষিত। তাই ভারত ছেড়ে মুসলমানদের অন্যদেশে আশ্রয় নিতে হয় না। বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত—এটা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। ■

পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক শাসকের

আর. এন দাস

গত ১৪০০ বছরে সারা বিশ্বে কট্টরপন্থী মুসলিমরা জেহাদে উদ্দীপ্ত হয়ে, তরবারির সাহায্যে নৃশংস হত্যা আর ধর্ষণের মাধ্যমে ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। আধুনিক যুগে 'আল তাকিয়া'র মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তিকে ছলেবলে কৌশলে দখল করে, রাজনৈতিক দলগুলির ভ্রষ্টনেতাদের কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় বসছে। সশস্ত্র দলবল নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় আসার মতো আজকের যুগে ইউরোপ, আমেরিকা (মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তর), এশিয়া আর আফ্রিকায় 'মুসলিম আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশ' তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত—কাফের, জিহাদ আর দার-উল-ইসলাম অথবা হারাবের তত্ত্ব ইসলামিক সন্ত্রাস ও সম্প্রসারণবাদের অভিন্ন অঙ্গ। লিবিয়ার প্রয়াত কর্নেল মুয়াম্মার গদ্দাফির 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ' আমেরিকার আণবিক বোমার বিস্ফোরণের চেয়েও সাংঘাতিক। বহু রন্ধ্রযুক্ত বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে অবাধে ভারতে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশের স্রোত অব্যাহত আছে শুধুমাত্র লোভী আর ভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অর্থাৎ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, নদীয়া, কোচবিহার, দুই ২৪ পরগনায় আজ হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, বর্তমানে শাসকদল তৃণমূল। দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, সংবিধান-বহির্ভূত আইনের সাহায্যে বহিরাগত মুসলমানদের ভারতের নাগরিকতার প্রমাণপত্র পর্যন্ত সরবরাহ করছে। কেন? শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটের লালসায়। 'মুসলিম তুষ্টিকরণের' প্রতিযোগিতা চলছে ২১টি বিরোধী দলের লোভী নেতাদের মধ্যে। মোদীকে দেশে এবং আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় কট্টর হিন্দুত্ববাদী উগ্র হিন্দুনেতা রূপে দেখিয়ে, মুসলমানদের মনে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করছে। বিগত নির্বাচনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে, বিজেপির যেসব প্রার্থী হেরেছেন, তাঁদের এলাকার ভোটারদের মধ্যে সংগঠিত মুসলিম ভোট এবং দ্বিধাবিভক্ত হিন্দু ভোটের কারণেই নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আগ্রহী পাঠকদের অনুরোধ করবো, খ্রিস্টান মিশনারি ডাঃ পিটার হ্যামন্ডের লেখা, 'টেররিজম, স্লেভারি অ্যান্ড ইসলাম' বইটি অবশ্য পড়ার। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়। দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমের সংখ্যা ছিল ১২% আর আজ সেই সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭%। কোনো কোনো শহরে তো ৬৭% পর্যন্ত। আর বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩০% আর আজকে তা হয়েছে মাত্র ৭%। কারণ বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, ধর্ষণ, হত্যা, অত্যাচার আর বিতাড়ন। পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবার এবং বীরভূমের লাভপুর কেন্দ্র ছাড়াও অসংখ্য জায়গায় হিন্দুদের ভোটই দিতে দেওয়া হয়নি। কারা বাধা দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকতেও? তারা শাসকদল আশ্রিত মুসলমান দুষ্কৃতী। গত কয়েক বছর ধরে মুসলিমদের দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে এক গভীর ষড়যন্ত্রের অশনি সংকেত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা সংখ্যা বাড়লেই, তাদের দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য থাকছে শাসকদল। হিন্দুরা বিতাড়িত হচ্ছে, শরিয়া আইন চালু হচ্ছে। মুসলমানদের চিরাচরিত পথ লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ এবং আতঙ্কিত হিন্দুদের উপর অত্যাচার আর শাসকদলকে হাতে রাখা। আজ পশ্চিমবঙ্গের আইনের ধ্বজাধারী পুলিশ পর্যন্ত মুসলিমদের শাসন মেনে চলতে বাধ্য থাকছে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

২০০৭ সালে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশি লেখিকা ডাঃ তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় আগমনে এক ভীষণ মারপিট ও দাঙ্গা শুরু হয়। মিলিটারি নামানো হয়, সরকারি বাস ও ট্রাম জ্বালানো হয়। কারণ বাংলাদেশি সংখ্যালঘু হিন্দুদের অত্যাচারের উপর লিখিত এক করুণ উপন্যাস 'লজ্জা'র উন্মোচনে আগ্রাসী মুসলিমদের সংগঠন সিমি এবং পাকিস্থানের আই.এস.আই-এর সহযোগিতায় এটা ঘটে। ঠিক যেমন প্যারিসে 'চার্লি হেবডো'র হত্যা হয়েছিল। ইসলামের কুকীর্তির কথা বা সমালোচনা করা যাবে না। তাহলেই সারা বিশ্বে আগুন জ্বলে উঠবে।

২০১৩ সালে কোনো একজন মৌলভির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে হাজার হাজার নির্দোষ হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, হিন্দু মন্দিরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, দোকান লুট করা, হত্যা, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। পুলিশ অনেক পরে আসে কিন্তু কোনো অপরাধী ধরা পড়েনি। সরকার থেকে কোনো ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয়নি ক্ষতিগ্রস্তদের। টিএমসির লোক বলে অপরাধী গিয়াসুদ্দিন মোল্লার নামে পুলিশ কোনো এফ.আই.আর নেয়নি।

কালু সর্দার বা আজিজুল সেখের প্ররোচনায় ২০১৫ সালে ২৯শে জানুয়ারিতে কলকাতার শহরতলিতে জেহাদি গুন্ডারা হিন্দুদের প্রায় ৫০টি দোকান লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয় পুলিশের উপস্থিতিতেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সমস্ত কিছু জানলেও কোনো মন্তব্য বা সহায়তা করেননি আক্রান্তদের। সরকারের মদতে দুষ্কৃতকারীরা এতটাই সাহস পেল যে তারা পুলিশকে পর্যন্ত ধাওয়া করে অনেকের মাথা ফাটিয়ে দিল। কেউই ধরা পড়ল না।

২০১৭ সালে কলকাতার উপকূলে বসিরহাটের বাদুরিয়াতে শৌভিক সরকার নামের এক স্কুলছাত্রের ফেসবুকে কাবার ছবি ছাপানোকে কেন্দ্র করে, মুসলমানরা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে বহু হিন্দুর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। বহু জাতীয় এবং বিদেশি পত্রপত্রিকায় এ ঘটনা স্থান পেয়েছে।

জেহাদি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে জামাই আদরে পালিত হচ্ছে সেই কংগ্রেসের আমল

থেকেই। 'সব দোষ, নন্দ ঘোষ' অর্থাৎ হিন্দুরাই অন্যায় করেছে, তাই জেহাদিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটাই নিয়ম। যেসব জেলায় অর্থাৎ মালদহ, মুর্শিদাবাদে, মুসলিম আধিক্য সেখানে হিন্দুরা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে না। তাদের দোকানে কোনো মুসলমান কিনবে না, কারণ তারা মালাউন বা কাফের। হিন্দুরা অত্যন্ত নগণ্য অবস্থায় মুসলিমদের তোষামোদ করে বেঁচে থাকে সেইসব এলাকায়। কেননা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থেকে, কাউন্সিলার, এম.এল.এ আর এম.পি, থানার দারোগা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আর স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা সবই মুসলমান অথবা মেরুদণ্ডহীন হিন্দু। তা না করে উপায় নেয় যে। 'জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াই'? বর্তমান প্রতিবেদকের পৈতৃক বাড়ি মুর্শিদাবাদে। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে এখানে। এসব কী ভাবে হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের জন্য হজ টাউয়ার করে দিয়েছেন। 'অল আমিন' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ, সেখানে মুসলিম ছাত্রদের মাধ্যমিকের এবং উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র লিক করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতায়। মুসলিম মেয়েদের সাইকেল, মুসলিম ছেলেদের ল্যাপটপ, মুসলিমদের জন্য টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এমনকী হাসপাতাল পর্যন্ত করে দিয়েছেন। এটা বিভেদের রাজনীতি নয় কি? মুসলমানরা গর্বের সঙ্গে নিজের ধর্মমত প্রকাশ করে। আর হিন্দুরা করলেই তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টের রায় অমান্য করে 'ওয়াকফ বোর্ডের' তহবিল থেকে মাসিক 'ইমামভাতা' ও 'মুয়াজ্জিন ভাতা'র বন্দোবস্ত করেছেন। মমতা ব্যানার্জি হিজাব পরে ইফতার পার্টিতে যাচ্ছেন। তিনি 'ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর' কথা অমান্য করে পাকিস্তানি নাগরিক, সিমির প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা ও 'দৈনিক কলমের' সম্পাদক 'ইমরান হাসন'কে ভারতের পার্লামেন্টে তৃণমূলের যোগ্য সাংসদ হিসাবে পাঠাতেও দ্বিধা করেননি।

পশ্চিমবঙ্গ আজ পশ্চিমবাংলাদেশ হওয়ার পথে। হিন্দুদের সম্পত্তি মুসলিমরা সস্তায় কিনছে শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে, মাজার বানিয়ে, মসজিদ বানিয়ে, লম্বা দাড়ি আর জালিদার ফেজটুপির ভয় দেখিয়ে। বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে মমতার জয়গান করছেন। বর্তমান প্রতিবেদক তথাকথিত শিল্পী শুভাপ্রসন্নর সল্টলেকের বাড়িতে গেছিলেন শুধু তাঁকে এইটুকু জানতে যে মমতা ব্যানার্জি কীভাবে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'জামাইতি-ইসলামির' খপ্পরে পড়েছেন। এখন আর বেরিয়ে আসতে পারছেন না। সারদা-নারদা-রোজভ্যালি ইত্যাদি চিটফান্ডের টাকা কোথায় যায় জানেন? বাঙ্গালি হিন্দুর শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ করে, বাংলাদেশে অবস্থিত, সৌদি আরবের টাকায় পালিত এবং পাকিস্তানি আই.এস.আই-এর সাহায্যপুষ্ট ইসলামিক সংগঠনগুলিতে।

আমরা রাজনীতির লড়াই করে নিজেরা নিজেদের মেরে ফেলছি। বলুন তো কতগুলো জেহাদি মরেছে রাজনৈতিক হিংসায়, দাঙ্গায় বা পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে! মুঘলযুগে রাজপুতরা নিজেদেরকেই মারতো যুদ্ধে বাদশাদের খুশি করতে। পুষ্পেন্দু কুলশ্রেষ্ঠের মতে ৪২ হাজার ভারতীয় সৈন্য শহিদ হয়েছে শুধুমাত্র কাশ্মীরের জঙ্গিদমনে। আর কট্টরপন্থীরা সমানে সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরাতে এদের সাহায্য নিয়ে সি.পি.এমের খুনি ক্যাডাররা স্বয়ংসেবকদের রুটিনমাফিক খুন করতো।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হিন্দু ভোটারদের বোকা বানাচ্ছেন। সব জায়গায় হিজাব পরে, রোজা রেখে, ইমাম বরকতি, সিদ্দিকুলা চৌধুরী, ত্বহা সিদ্দিকি প্রভৃতি মৌলবিদের কথায় ১০ হাজার বেআইনি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে ইসলামিক ভাষায় পরিণত করেছেন। রথযাত্রা, রামনবমী, দুর্গা বা সরস্বতী পুজায় বহু স্থানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অন্যদিকে দেশপ্রেমের পাঠশালা সরস্বতী শিশু মন্দিরগুলি সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে নিষিদ্ধ করার মতলব করছেন।

সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির কারবার কিন্তু রমরমা। এর একমাত্র সমাধান এরাজ্যের মানুষ সচেতন হয়ে ক্ষমতায় আনতে হবে প্রকৃত দেশপ্রেমিক সরকারকে। তবেই এই বিভীষিকাময় রাজত্বের অবসান হবে।

খাস সমাচারের পূজা সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২৮ সেপ্টম্বর হুগলী জেলার জটিল ম্যাগাজিন খাস সমাচারের পূজা সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান শ্রীরামপুর সুরাঙ্গন অভিজ্ঞানের জগবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন

বিশিষ্ট কবি রামকিশোর ভট্টাচার্য, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের হুগলী জেলা সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী, আইএমএ-র শ্রীরামপুর শাখার সভাপতি ডাঃ পি কে দাস। উপস্থিত ছিলেন খাস সমাচারের সম্পাদক গোঁসাই চন্দ্র দাস, কবি শৈলেন দত্ত, অনিমেষ গোস্বামী, সঞ্চারী গোস্বামী প্রমুখ। খাস সমাচরের প্রকাশের পরেই স্থানীয় চিরিৎসক ডাঃ পি কে দাসের দুটি পুস্তকের উন্মোচন হয়। এই উপলক্ষ্যে কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন তন্ময়ী চক্রবর্তী, শ্রুতি নাটক পরিবেশনায় ছিলেন শ্রীমতা নন্দিতা সিংহ ও ধ্রুব বাগচী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অম্বালিকা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে এলাকার সংস্কৃতি মনস্ক বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পাণ্ডুয়ায় বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের বস্ত্র বিতরণ

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া তারাপদ ভবনে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সাইকো নিউরোথেরাপি রিসার্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউ ও বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। ২১০ জন দুঃস্থ শিশু, বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে জামা-প্যান্ট, ফ্রক, ধুতি, শাড়ি দেওয়া হয়।

কর্মসূচির আযোজক ছিলেন সাইকোনিউরোথরাপি চিকিৎসা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় দেব। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সদানন্দ কুমার, রামকৃষ্ণ শর্মা, তুহিন, সুভদ্রা শর্মা, হিরন্ময় চ্যাটার্জি, তুলিকা দেবী প্রমুখ।

কলকাতা পিআইবি-র উদ্যোগে সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে সাহিত্য সভা

প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো, কলকাতার উদ্যোগে গত ২৪ অক্টোবর কলকাতা সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে বাংলা কবিতা ও ছোটো গল্পের ওপর এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অনির্বাণ বসু, শ্রীমতী অনুরাধা মহাপাত্র, শ্রীমতী কস্তুরি সেন, পার্থজিৎ চন্দ ও সাদিক হুসেন উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সাহিত্য অ্যাকাডেমির পূর্বাঞ্চলীয় সচিব ড. দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ সকলকে স্বাগত জানান। সাহিত্য অ্যাকাডেমির বাংলা উপদেষ্টা পর্ষদের আহ্বায়ক ড. সুবোধ সরকার সহিত্য সভার উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

বর্তান সময়ে কর্মহীনতার সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প 'বদ্বীপ' পাঠ করেন অনির্বাণ বসু। বন্ধুত্বের ওপর গল্প 'মারাদোনার বাম পা' পড়ে শোনান সাদিক হুসেন। শ্রীমতী অনুরাধা পাত্র 'এলেন চলেও গেলেন জীবনানন্দ' , 'দৃষ্টি' , 'পুরনো শশী' , 'আমাকে বাঁচাও দেবযানী'-সহ তাঁর কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনান। শ্রীমতী কস্তুরি সেন তাঁর কবিতা 'দাহ' , 'ছুতো' , 'খলা' , 'পর্যায় ভাগ ভুল' , 'দিনলিপি' পাঠ করে শোনান। পার্থজিৎ পড়ে শানান তাঁর 'আরণ্যক' , 'বিষাদ সিন্ধু' , 'আমন ধানের ক্ষেতে' , 'গিরিপথ' , 'মোমবাতি'-সহ বেশ কয়েকটি কবিতা।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন

পরিবার ও সমাজে বিলুপ্তপ্রায় শ্রদ্ধার পুনর্জাগরণ ঘটাতে এবং বাবা-মকে বৃদ্ধাশ্রমে না পাঠিয়ে নিজের ঘরে রেখে সেবাযত্ন করবে– এই লক্ষ্য নিয়ে গত ১১ বছর ধরে বীরভূম জেলার সিউড়ী নগরের স্বনামধন্য সংস্থা 'শ্রদ্ধা' সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারী অর্থাৎ ৮০ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধ্ব

ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আসছে। তারই অঙ্গ হিসেবে গত ২৮ অক্টোবর বীরভূম জেলার ইলামবাজার সংলগ্ন ঊষাডিহি গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত পোস্ট মাস্টার গঙ্গাধর মুখার্জি ও তাঁর সহধর্মিণী ঊষারানি মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন দীনেশ চট্টরাজ ও ডাঃ তপন মিশ্র। মুখার্জি দম্পতিকে পা ধুইয়ে দিয়ে পূজা করেন তাঁদের দুই পুত্রবধূ সুপর্ণা মুখার্জি ও গীতশ্রী মুখার্জি। তুলসী চক্রবর্তী আরতি করেন। উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল, মিষ্টি ও মানপত্র দিয়ে ভূষিত করেন মহাদেব মুখোপাধ্যায়, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর ঘোষাল, সুব্রত সিংহ প্রমুখ। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন বনানী চৌধুরী, তৃণা মখার্জি, অসীমা মুখার্জি ও ঋদ্ধি মিশ্র। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পতিত পাবন বৈরাগ্য এবং ধন্যবাদ জানান অধ্যাপিকা চৈতালি মিশ্র।

সুইডেনে বাঙ্গালি সম্মেলন

সুইডেনের লিংশপিং শহরে মাত্র ১০ টি বাঙ্গালি পরিবারের বাস। তাদের উদ্যোগেই গত ২৮,২৯ অক্টোবর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। লিংশপিং উৎসব কমিটির সম্পাদিকা সৌমিকা কাপাসী পাল নিজের উদ্যোগে কলকাতার কুমারটুলি থেকে মায়ের মূর্তি ও পূজার সামগ্রী আনিয়েছেন। উল্লেখ্য, এখানকার বহু

অবাঙ্গালি পরিবার এই বাঙ্গালি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

পূজার দুদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলাকুশলীদের আনা হয়। স্থানীয় সুইডিশ শিল্পীরাও তাদের নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ড. বিপ্লব পাল জানান, এই দুদিন তাঁরা চেষ্টা করেন ভারতবর্ষের একটা ছোটো রূপ সকলের সামনে তুলে ধরার।

অস্ট্রেলিয়ার সংসদে দীপাবলি উদ্‌যাপন

স্বয়ং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এবার সেদেশের সংসদে দীপাবলি উৎসব পালন করেছেন। উৎসবের সূচনা করে তিনি সহকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, চোদ্দ বছর হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার সংসদে দীপাবলি পালন করা হচ্ছে। দীপাবলির লক্ষ্যটি অসাধারণ– এই উৎসবে অন্ধকারকে জয় করার জন্য আলোর আবাহন করা হয়। অজ্ঞানতা দূর করার জন্য জ্ঞানের আরাধনা করতে প্রেরণা দেয় দীপাবলি। অশুভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুভচেতনার আধারস্বরূপ হয়ে ওঠে দীপাবলি। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল অস্ট্রেলিয়ার হিন্দু কাউন্সিল।

সংস্কৃতভারতীর আবাসীয় প্রবোধন বর্গ

গত ২১ থেকে ২৮ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে নদীয়া জেলার করিমপুরে কেচুয়াডাঙ্গা বিধান চন্দ্র বিদ্যানিকেতনে ৭ দিনের আবাসীয় সংস্কৃত প্রবোধন বর্গের আয়োজন

করা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ৪০ জন শিক্ষক শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বর্গের উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাঁড়ের মাঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। বর্গে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষাতেই পঠনপাঠন ও কথপোকথন করেন। বর্গের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংস্কৃত শোভাযাত্রা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উদয় সিহি। দীক্ষান্ত পর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে সংস্কৃতময় ভারতবর্ষ গড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

বক্সিরহাটে পরিবার প্রবোধনের সভা

গত ২ নভেম্বর কোচবিহার জেলার বক্সিরহাটের বারোকোদলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবার প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল নন্দী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সিংহ। এলাকার

বিভিন্ন স্থান থেকে ৬৫ জন মা-বোন সহ ১৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিবার প্রবোধনের উত্তরবঙ্গ পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক অমৃত ভাওয়াল।

আমতায় ক্রীড়া ভারতীর কবাডি ও টেকনিক্যাল খেলার প্রশিক্ষণ

সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, সুস্থ সমাজ ও সুস্থ দেশ গড়ার লক্ষ্যে যুব সমাজকে সক্ষম করে তুলতে হাওড়া জেলা ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে কবাডি কোচ ও টেকনিক্যাল খেলা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় হাওড়া জেলার আমতা বালিকা বিদ্যালয়ে। ৭০ জন বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে

প্রশিক্ষণ দেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্তরের কবাডি কোচ পিন্টু ভবানী, অমিত সরকার। বিশেষ ভাবে ছিলেন অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী কবাডির জাতীয় কোচ বিশ্বজিৎ পালিত। ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া জেলা সম্পাদক শুভেন্দু সরকার জানান, কবাডি, খো খো, ক্যারাটে ইত্যাদি খেলাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতেই ক্রীড়া ভারতীর এই উদ্যোগ।

পুরুলিয়ায় শিক্ষক সঙ্ঘের বিজয়া সম্মেলন

পুরুলিয়া জেলা বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয় পুরুলিয়া শহরে সেবা ভারতীর কার্যালয়ে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত কুমার দে, জেলা কার্যবাহ দিলীপ গরাই, জেলা প্রচার প্রমুখ স্বপন বাউরি, পুরুলিয়া শহরের চিত্তরঞ্জন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষক বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অসিত কুমার দে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি পার্থ গাঙ্গুলি।

অর্জুনের রথ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় গ্রন্থ 'গীতা'র কথা স্মরণে এলেই, সর্বপ্রথম তাঁর প্রচ্ছদে প্রিয় ভক্ত অর্জুন এবং তাঁর সুন্দর তেজোময় রথে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ— এই চিত্র জেগে ওঠে। সেই সুন্দর তেজোময় রথে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় ভক্ত অর্জুন বিরাজমান থাকায়, রথটির শোভা এবং তেজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে, অন্য যাবতীয় স্মৃতিকে ম্লান করে, শুধুমাত্র ওই রথের স্মৃতিকে হৃদয়ে চিরন্তন ভাবে জাগরিত করে রাখে।

গীতার প্রচ্ছদচিত্রে বিখ্যাত হয়ে থাকা অর্জুনের সেই রথ, যাঁর দ্বারা প্রদত্ত তিনি কুমারীগণের অধিপতি, তাঁকে সাক্ষী রেখে, তাঁর নিকট থেকে বর বধূকে গ্রহণ করে। যাবতীয় যজ্ঞকর্মে তিনিই প্রধান সহায়। তিনি সমিদ্ধ না হলে কোনো যজ্ঞকর্মই পূর্ণাঙ্গ সফলতা-সহ সম্পাদিত হয় না। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে তাঁর কাছে যে আহুতি দেওয়া হয়, তিনি তা সেইসব দেবতাদের উদ্দেশে বহন করে নিয়ে যান; তিনি তাই 'হব্যবাহ'। মর্ত্যে তিনি হলেন দেবগণের দূত। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনকারী। দেবগণকে তিনি যজ্ঞস্থলে আবাহন করে নিয়ে আসেন। তিনি হলেন দেবগণের পুরোহিত, তিনি একাধারে হোতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। তিনি দেবতাদের মুখ স্বরূপ। তাঁতে সমর্পিত হবি গ্রহণ করে দেবতারা তুষ্ট হন। তিনি ঘৃতান্ন, তিনি ঘৃতনির্ণিক ও ঘৃতপৃষ্ঠ। লেলিহান শিখা তাঁর জিহ্বা। বিদ্যুতের ন্যায় হিরণ্যবর্ণের অতি উজ্জ্বল রথে তিনি গমনাগমন করেন। যজ্ঞে আহূত সমস্ত দেবতাদের তিনিই যজ্ঞস্থলে বহন করে আনেন। তিনি অগ্নিদেবতা। যাস্কাচার্য বলেছেন যে, দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হবির বহন এবং দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আবাহন— এই দুটিই অগ্নির প্রধান কার্য।

ঋক্‌বেদের দু'শটি সূক্তে স্তুত মুখ্যদেবতা অগ্নি, প্রতিনিয়ত ঘৃতের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে এবং ঘৃতাহুতির ঘৃত আহার করতে করতে একবার অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, অগ্নিদেব খাণ্ডববন গ্রাস করে অর্থাৎ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিজ অজীর্ণ রোগ দূর করতে চেয়েছিলেন। কেন? তার আসল কারণ হলো, খাণ্ডববনে অজীর্ণের মহৌষধস্বরূপ বহু জড়িবুটি ছিল।

খাণ্ডববনের রক্ষক ছিলেন দেবতাগণ। তাঁরা কিছুতেই অগ্নিদেবকে তাঁর ওই কার্যে সফল হতে দেবেন না। অগ্নিদেব যতবারই খাণ্ডববন দহন করতে শুরু করেন, তখনই বর্ষার দেবতা ইন্দ্র বৃষ্টির জলে অগ্নি নির্বাপিত করে দেন। এমত অবস্থায়, শেষকালে অর্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেব সমস্ত বনটি দহন করে তাঁর অজীর্ণ রোগ দূর করেন এবং প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকে সেই রথটি উপহার দেন। ন'টি বলদবাহিত শকটে যত অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যায়, এই রথটিতে ততটাই বহন করা যেত। রথটি স্বর্ণমণ্ডিত এবং তেজোময়। এর চাকাগুলি ছিল বিশাল ও দৃঢ় ধ্বজাটি বিদ্যুতের মতো ঝলক দিত। রথের ধ্বজাটি এক যোজন বা চারক্রোশ দূর থেকে দেখা যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি রথের ভার স্বরূপ ছিল না বা কোথাও থেমে যেত না কিংবা বৃক্ষ ইত্যাদিতে আটকে যেত না। ধ্বজাটির ওপর হনুমান বিরাজমান ছিলেন।

গন্ধর্ব চিত্ররথ অর্জুনকে একশত দিব্য ঘোড়া দিয়েছিলেন। এই ঘোড়াগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে, এরা যুদ্ধে নিহত হলেও কখনোই সংখ্যায় কমত না, অর্থাৎ সবসময়ই পুরো একশোই থাকত। এরা পৃথিবী বা স্বর্গ যে কোনো স্থানেই বিচরণ করতে পারত। এদের মধ্য থেকেই চারটি সুন্দর শিক্ষিত সাদা ঘোড়া অগ্নিদেবতা-প্রদত্ত অর্জুনের সেই রথকে চালিত করার জন্য যুক্ত করা হয়েছিল।

গীতার আধ্যাত্মিক রূপমাধুর্যে মানবদেহ যদি কুরুক্ষেত্র হয়, জীবাত্মা যদি অর্জুন হন এবং পরমাত্মা যদি কূটস্থ চৈতন্য-শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে অর্জুনের সেই রথ আজও চলছে এবং জীবের অন্তরে আবহমানকাল ধরে চলবে।

রুদ্রাম্মাদেবী

ভারতের এক অনন্যা বীরাঙ্গনা

কৌশিক রায়

শুধু বীর প্রসবিনীই নয়, দেশপ্রেমিক ও অকুতোভয় বীরাঙ্গনাদেরও পুণ্য জন্মভূমি আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ। সেজন্যই, লুণ্ঠনকারী ও বর্বর, বৈদেশিক আক্রমণকারীদের শাস্তি দিতে, ভারতের মহিমাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে যুগে যুগে এদেশে সর্বশক্তিময়ীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানি দুর্গাবতী, রানি চেন্নাম্মা, ভবশঙ্করীর মতো অসম-সাহসি বীরাঙ্গনারা। তাঁদেরই ঐতিহ্যবাহী অস্তিত্বের পাশে অবশ্যই স্থান করে নিতে পারেন দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানা রাজ্যের অন্তর্গত ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় বংশের রানি— রুদ্রাম্মা দেবী। বিভিন্ন অস্ত্র ও অশ্ব চালনাতে দক্ষ, প্রজা-কল্যাণকামী প্রশাসনিক কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণে এবং সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় সিংহহৃদয়া রানি রুদ্রাম্মাদেবী ছিলেন অদ্বিতীয়া।

ত্রয়োদশ খ্রিস্ট্রীয় শতকে কাকতীয় বংশের শাসক ছিলেন গণপতিদেব। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন— পুত্রদের থেকে কন্যা রুদ্রাম্মাদেবীর মধ্যেই রাজ্য শাসন এবং শত্রুর মুখোমুখি হওয়ায় দূর্জয় সাহস বেশি আছে। তাই গণপতিদেব প্রশাসন, রাজস্ব ব্যবস্থা এবং জনকল্যাণের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যক্তিত্বময়ী ও দূরদর্শিনী কন্যা— রুদ্রাম্মা দেবীর ওপর অনায়াসে নির্ভর করতেন। দীর্ঘদেহী, পুরুষ সৈনিকের সাজে সজ্জিতা, ঢাল, তরবারি ও বর্শা নিয়ে সুদর্শনা রুদ্রাম্মা দেবী যখন যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন, তখন তাঁর চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রতা আর সমরকুশলতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত সবাই। পরবর্তীকালে মোগল বাদশাহ আকবরের সামনে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলা, গণ্ডোয়ানা রাজ্যের রানি দুর্গাবতীর সঙ্গে তুলনা করা যায় তেলেঙ্গানার রুদ্রাম্মা দেবীর। রাজস্ব আদায়ে জমিদার এবং সামন্তপ্রভুদের ওপর কড়া নজর রাখতেন রুদ্রাম্মা দেবী। কোনও দোকানদার বেশি দামে জিনিস বিক্রি করলে বা ওজন কম দিলে সঙ্গে সঙ্গেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতো। নিজে ছদ্মবেশে গ্রাম্য মহিলাদের সঙ্গে মিশতেন। মন দিয়ে শুনতেন তাঁদের সুখ-দুঃখের সমস্যার বারোমাস্যা। রাজপরিবারের আভিজাত্যে বড়ো হয়ে উঠলেও অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন রুদ্রাম্মা দেবী। প্রজারাও এই রানিকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতো।

১২৬৩ সাল থেকে আনুমানিক ১২৯৫ সাল বা নিজের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে কাকতীয় রাজবংশের দায়ভার সামলে ছিলেন রানি রুদ্রাম্মা দেবী। তিনি সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে সমানাধিকার রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রথা অনুযায়ী শুধু অভিজাত ও উচ্চবংশের যুবকরাই নয়, অতি সাধারণ বা কৃষক বংশের যোগ্য সন্তানরাও প্রশাসনিক ও সামরিক পদে নিযুক্ত হতে পারতো। দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে দরিদ্র কৃষকদের জন্য খাজনা মকুব করে দিতেন সহৃদয়া রুদ্রাম্মা দেবী। রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে তখন প্রজাদের খাবার বিতরণ করা হতো। পরবর্তীকালে রানি রুদ্রাম্মার এই জনহিতকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে, কর্ণাটক রাজ্যে গড়ে ওঠা বিজয়নগর রাজ্যের শাসক কৃষ্ণদেব রায়।

রানি রুদ্রাম্মার সমকালীন একটি মুদ্রাতে যাদব বংশীয় রাজা মহাদেবের রাজকীয় প্রতীকের ওপর রানি রুদ্রাম্মার প্রতীক বিষ্ণু অবতার বরাহের ছবি খোদাই করা আছে।

রাজত্বের শেষ ধাপে অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হয় রানি রুদ্রাম্মাকে। কায়স্থ গোষ্ঠীদের দলপতি অম্বাদেবের বিদ্রোহকে দমন করতে ব্যর্থ হন তিনি। পশ্চিম অন্ধ্র বা বর্তমানের গুন্টুর জেলাটিকে রানি রুদ্রাম্মার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন অম্বাদেব। সম্ভবত, অম্বাদেবের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামেই তেলেঙ্গানার চান্দুপাত্তা নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বীরাঙ্গনা। ইতিহাস থেকে জানা যায়— রানি রুদ্রাম্মা, চালুক্য রাজবংশের রাজপুরুষ বীরভদ্রকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের পুত্রসন্তান ছিল না। দুটি কন্যাসন্তান হয়। সেই এক কন্যারই পুত্র প্রতাপরুদ্র। তিনি রানি রুদ্রাম্মার প্রয়াণের পরে কাকতীয় রাজবংশের সিংহাসনে বসেন। তবে, ততদিনে কাকতীয় রাজবংশের শেষলগ্ন চলে এসেছিল। কেননা, রানি রুদ্রাম্মার মতো সুযোগ্য শাসক আর পায়নি এই রাজবংশ। ■

মৃদঙ্গ

চূড়ামণি হাটি

মাটির অঙ্গ নিয়ে মৃদঙ্গ— বৈষ্ণবী ভাষায় শ্রীখোল নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য খোল নানা সময় তার রূপ বদলে নিয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ মতো প্রচলিত মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলের রূপ দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে কান্দি বড়ঞা থানার গৈড়া গ্রামের ছোটো হরিদাস। নিজে সুকণ্ঠের অধিকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৈড়া গ্রামের পাশে পাঁচথুপি-সহ হরিশ্চন্দ্রপুর, ওলকুণ্ডা, কান্দী এবং নদীয়ার নবদ্বীপ মৃদঙ্গবাদ্য নির্মাণে নাম করেছে। মালদা জেলার গৌড়ের রামকেলী গ্রামে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির মেলায় বসে মৃদঙ্গবাদ্যের অনেক দোকান। বীরভূমে ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড-সহ নানা স্থানে হরিবাসরকে কেন্দ্র করে এই বাদ্য বাজানোর শিক্ষা চলে। স্থান বিশেষে নানা ঘরানা।

বাংলা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ বাদ্যেরও প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে। কীর্তন গান যিনি করেন তিনি কীর্তনীয়া আর মৃদঙ্গ বাদক হলেন মার্দঙ্গীক। গুরু পরম্পরা চর্চা। অবশ্য কীর্তন ছাড়া নানা নৃত্য গীতেও এ বাদ্যের সুরকে বেছে

নেওয়া হয়। কুম্ভকাররা নদীর এঁটেল মাটি দিয়ে চাকের সাহায্যে শ্রীখোলের অঙ্গ বা কাঁড়িটির দু' প্রান্ত করে নিয়ে কাঁচা অবস্থায় জোড়া দেন। শুকিয়ে আগুনের তাপে মাটির নরম ভাব শক্ত করে নিয়ে চামড়া দিয়ে ছোট্ দেওয়া বা ছাওনির কাজটি হয়। কাজটি করেন চর্মকাররা।

বাদ্যের দু'দিকও চর্মযুক্ত তালি। ডান মুখের তালির গাব পোড়ামাটি, কালি, ভাত বা আঠার মিশ্রণ কিংবা আঠার সঙ্গে গাওয়া ঘি, তেল, তিল চূর্ণের মিশ্রণ দেওয়া হয়।

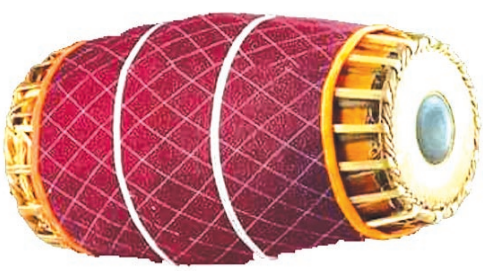

পরম্পরা

ডান মুখের ব্যাস চার ইঞ্চি এবং বাম মুখের ব্যাস ছয় ইঞ্চি। দু' মুখ চামড়া দিয়ে টান রাখা থাকে। ফিতের সাহায্যে দু' কাঁধে ঝোলানো মৃদঙ্গ হলো অলিঙ্গ এবং এক কাঁধে ঊর্ধ্ব মুখী মৃদঙ্গ হলো ঊর্ধ্বক। আর কোলে রাখা মৃদঙ্গটি হলো আঙ্কিক। যাইহোক, মৃদঙ্গ দেখতে কিছুটা মাদলের মতো। খয়ের কাঠ দিয়েও খোল হয়। মণিপুরে কাঠের তৈরি খোলকে বলে পুং। নৃত্যনাট্যে এ ব্যাদ্যের ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়।

নর্তকীর নৃত্যে তাল রাখতে এরূপ বাদ্যের ব্যবহার মধ্যযুগ থেকে হয়ে এসেছে। নানা ভক্তিমূলক গানের মধ্যে কীর্তনে মৃদঙ্গের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যেরও যোগ আছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' মৃদঙ্গ বাদ্য নিয়েই গীত হয়। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে বলা হয়েছে, 'মৃদঙ্গ বাজে ধি-কি ধিঙ্গা'। তালকে মাত্রা দ্বারা বেঁধে পরিমাপ করার সঠিক জ্ঞান নিয়ে এবং কোন হাতে ও আঙ্গুলে কোন বর্ণ উচ্চারিত হবে সে জ্ঞান নিয়েই মৃদঙ্গের তালি কাঁপানো হয়। মধ্যে স্ফীত এবং দু' প্রান্ত ঢালু এই বাদ্যটি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। আবেগের বহিঃপ্রকাশকে সঙ্গ দিতে সক্ষম হয়েছে চর্ম বাদ্যটি।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

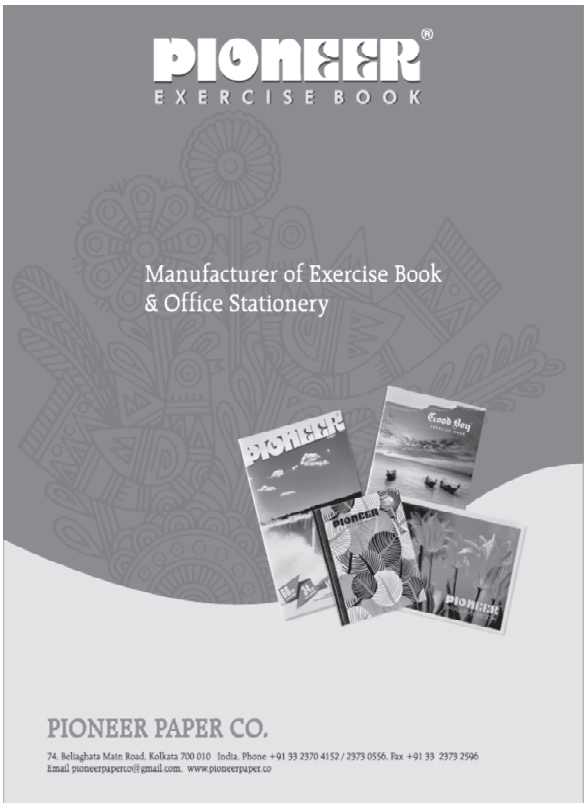

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

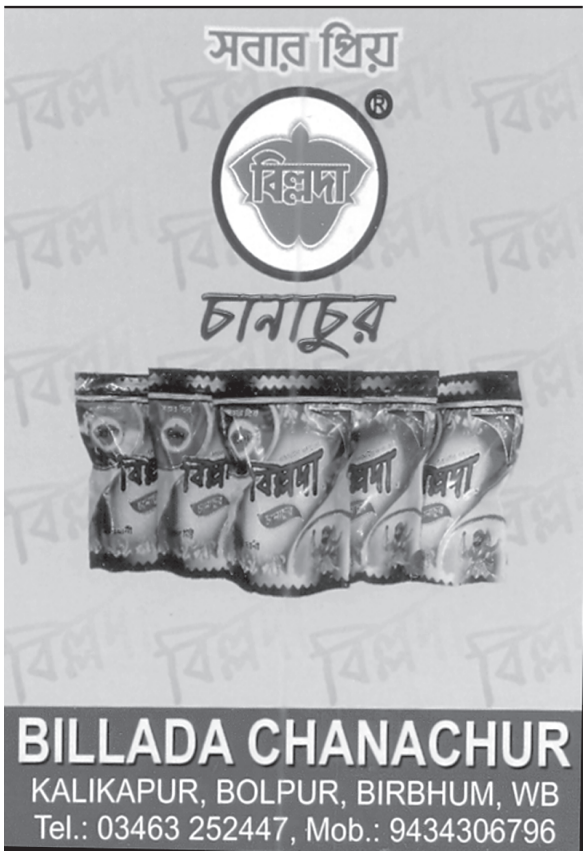

শহরের রূপকথা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

সবাই আবিরে রাঙিয়ে দিচ্ছে রুবিকে। সে অবাক হয়ে ফুটপাতের ধারের জারুল গাছটির দিকে চেয়েছিল। ধুলোয় ভরা কলকাতা শহরেও এত সুন্দর ফুল ফোটে!

সবাই তার দলের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। জয়ধ্বনি দিচ্ছে রুবির নামেও।

কতদিন এদিনটার অপেক্ষায় থেকেছে রুবি! কতবার ভেবেছে যদি এমন দিন না আসে! অবসাদ নেমে আসত রুবির জীবনে। হেরে যাওয়ার বেদনায় নয়, অন্যায় করেও জিতে যাওয়া যায়, যে সারাজীবন ন্যায়ের পথে চলেছে তাঁকেও হেরে যেতে হয় এ যদি সত্যি হতো তবে তার স্বপ্ন দেখার সাহসটুকু চলে যেত।

সবাই হৈ হৈ করে ওঠে— রুবিদি হাসছেন না কেন।

সে সামান্য হাসে।

বিরোধী দল খুব ভালো ফল করেছে। কিন্তু রুবির কাছে ওদের প্রার্থী বিস্তর ব্যবধানে হেরেছে। তার কারণ ওদের প্রার্থী শুভম। আর রুবি জানে সত্যের কাছে মিথ্যাকে হেরে যেতে হয়, এই বিশ্বাস নিয়েই তো সে এ শহরে এসেছিল কুড়ি বছর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে। সে কি সেকেলে? সেদিনও কলেজের বন্ধুরা তাকে সেকেলে বলত।

নিমেষে কুড়ি বছর আগের দিনগুলি রুবির সামনে ভেসে ওঠে। সেই শুভম, সেই সদ্য তরুণী রুবি, সেই বন্ধুরা, সেই সব স্বপ্নভরা দিন!

—আমি শুভম মিত্র। কেমিস্ট্রি অনার্স, ফাইনাল ইয়ার। তুমি তো রুবি? ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট? কলেজ করিডরে তাকে দেখে এগিয়ে এসেছিল শুভম।

সরল রুবি অবাক হয়ে ভেবেছিল— তাকে চিনল কীভাবে?

বোঝেনি। সে কিছু বোঝেনি।

শুভম তখন থেকেই রাজনীতি করত। রুবি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বড়ো হয়েছে। তার বাবা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী। কিন্তু তার রাজনীতি ভালো লাগত না। তবে শুভমকে ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল ওর কথা, ওর হাসি, ওর চাউনি— সবকিছু।

তারপর নেশাগ্রস্তের মতো দিন কেটেছিল। পড়াশুনা, গানবাজনা, বন্ধুবান্ধব, বাবা-মা সবকিছু ভুলে গিয়েছিল রুবি। তার দিবারাত জুড়ে স্বপ্ন জুড়ে, সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু শুভমের উপস্থিতি।

তখন সেকেন্ড ইয়ার। বন্ধুরা প্রস্তুত হতে লাগল স্বর্ণালি ভবিষ্যতের জন্য। কমলা বেনারসি আর চেলি পড়ে এক সন্ধ্যায় চোখের সামনে থেকে পান পাতা সরিয়ে শুভমের দিকে চেয়ে রইল রুবি। যজ্ঞের আগুনের চারপাশে শুভমকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খই ছড়াল।

শুভম বাবার চেয়ে অনেক বড়ো নেতা হয়ে উঠল। তখন দুই ছেলে-মেয়ে এসে গেছে রুবির জীবনে। সুখে তার জীবন ভরিয়ে দিয়েছিল শুভম। কতদিনই বা রইল সে ক্ষণিক সুখ!

—রুবিদি! পার্টি অফিসে যাবেন না?

কার যেন ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায় রুবি। ব্যস্ত হয়ে বলে— চলো।

দুই

সবাই চলে গেছে। বাবলিন বুলি মহাখুশি। ওদের মা জিতেছে। অনেকক্ষণ জেগেছিল ওরা। সবেমাত্র ঘুমিয়েছে। রুবি আলো নিভিয়ে, নাইটল্যাম্প জ্বেলে ব্যালকনিতে আসে।

রাতের কলকাতা বড়ো সুন্দর। ধোঁয়া নেই, গাড়ির হর্ন প্রায় নেই, পথচারীদের ভিড় নেই। স্তব্ধ শুনশান। আজ আবার চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার গোল চাঁদ। কতদিন চাঁদ দেখেনি রুবি। কত রাত কেটে গেছে ঘুম আসেনি। তবু বদ্ধ ঘরে বসে থেকেছে।

ব্যালকনিতে বসে রাতের কলকাতার সুন্দর রূপ দেখার সাধও হারিয়ে ফেলেছিল সে।

ভালো লাগত না। কিছু ভালো লাগত না। নিবিড় অবসাদে সে তলিয়ে গিয়েছিল। কতবার ভেবেছে জীবনের ইতি টানবে। বাবলিন আর

বুলির মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। সে চেষ্টায় বিরত হয়েছে।

একদিন সেই মেয়েটি তার আর শুভমের মাঝখানে এসে তার সংসার, তার জীবন তছনছ করে দিয়েছিল। রুবি বোঝেনি শুভম অনেক আগেই তার থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। ওই মেয়েটি না এলেও অন্য কোনও মেয়ে আসত।

সে একদিন বলেছিল— শ্রাবন্তী সবসময় তোমার সঙ্গে ঘোরে কেন? লোকে নানা কথা বলে। আমার খারাপ লাগে।

শুভম নির্বিকার মুখে বলেছিল, আমার খারাপ লাগে না।

রুবি নীচুগলায় বলেছে, তুমি কত বড়ো নেতা। তোমার পাশে ওকে মানায়? তবু সবসময় তোমার সঙ্গে থাকা চাই।

শুভম সোফায় হেলান দিয়ে বলেছে, কেন? দেখতে সুন্দর। ভালো চাকরি করে। ও কি সাধারণ মেয়ের মতো?

রুবি চমকে উঠেছে। তার সামনেই এভাবে বলছে কেন শুভম? সত্যিটা বুঝতে পেরেও স্বীকার করতে পারছিল না সে। শুভম তাকে ভালোবাসে না, কোনোদিনই ভালোবাসেনি। সে শুধু মনে মনে ভেবেছে, তারও তো রূপ, গুণ ছিল। শুধু শুভমকে ভালোবেসে রূপচর্চা, মননচর্চা সব ভুলে গিয়েছে সে।

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে— ছেলে, মেয়ে বড়ো হচ্ছে। ওরাই বা কী ভাবে? সংবাদপত্রে কত কী লেখা হচ্ছে। ওরাও তো পড়ে সেসব!

শুভম নিমেষে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িছে— বেশ। তুমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এ বাড়িতে থাকো। আমি আর আসব না।

রুবি নিভন্ত স্বরে বলেছে, আমি কি তাই বলেছি?

শুভম কোনও উত্তর না দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেডরুমে এসেছে। নিজের জামাকাপড় কিছু ফাইল ব্যস্ত হাতে গুছিয়ে নিয়েছে একটা ব্রিফকেসে। তারপর ঘুমন্ত বাবলিন আর বুলিকেও একবারও না দেখে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

রুবি আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বেঢপ শরীর। অনুজ্জ্বল ত্বক, দ্যুতিহীন চোখ, বিবর্ণ ঠোঁট।

তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একদিন তারও তো সবকিছু ছিল। তবে কেন আজ...।

শুভম সে রাতে ফেরেনি। তার পরের রাতেও না। রাতের পর রাত কেটে গেছে— ফেরেনি শুভম।

একদিন ডিভোর্সের কাগজপত্র এসেছিল। ডিভোর্স ফাইল করেছে শুভম।

কেঁদেছিল রুবি, তিনদিন-তিনরাত শুধু কেঁদেছিল। সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছে— কত কাঁদতে পারে একটা মানুষ?

তারপর বাবলিন আর বুলিকে নিয়ে সে বাবার কাছে ফিরে এসেছে। বাবলিন তখন মাধ্যমিক দেবে। বুলি ক্লাস সিক্স।

বাবা বলেছে— ও আমাকে ধরে বড়ো নেতা হতে চেয়েছিল, সে কাজ মিটে গেছে। তাই তোকে ভুলে গেছে।

বাবা তাদের তিনজনকে আনন্দে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিল। তবু গাঢ় অবসাদে ডুবে গিয়েছিল সে।

তিন

"একদা এমনই বাদল শেষের রাতে
মনে হয় যেন শত জনমের আগে
সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।"

সে কোনও পুরুষ নয়। সে এক নারী। রক্তমাংসের নারী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি চরিত্র। ভ্রমর।

রুবি আবার পড়তে শুরু করেছিল। বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, ক্লাসিক, আধুনিক যা-কিছু পেয়েছে তাই পড়েছে। তার তখন অখণ্ড অবসর। বহুবার পড়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আবার পড়তে গিয়ে সে চমকে উঠেছে। বই বন্ধ করে নীরবে বলেছে, তুমি যদি অত যুগ আগে স্বামীকে লিখতে পারো ভ্রমর, 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি। যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার পরে আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।" তবে এ যুগে জন্মে আমিই বা তার আসার আশায় বসে থাকি কেন?

রুবি সন্তান সামলে নিজের দিকে তাকাতে শিখেছে। নিজের শরীরের দিকে, মনের দিকে, কেরিয়ারের দিকে, জীবনের দিকে।

বাবা তাকে রাজনীতির জগতে নিয়ে এসেছিল।

চার

আজ যা হচ্ছে সবই নাটক। যে নাটকের চিত্রনাট্য রচয়িতা রুবির বাবা, বাবা জানতেন অন্য দল থেকে দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত হওয়ার পর শুভম এ দলে ফিরে আসতে চাইবে। দলনেত্রী রেগে ছিলেন। ফোনেই না বলতে পারতেন। কিন্তু বাবার অনুরোধে আজ ওর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন। দলনেত্রীর পাশে রুবি বসে রয়েছে।

শুভম ঘরে ঢুকছে। হাসিমুখে দলনেত্রীকে প্রণাম করতে এগিয়ে আসছে। পাশে বসা রুবিকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। সবিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে। সেই রুবি নয়। যেন কুড়ি বছর আগে ফিরে গেছে সে। না, তাও নয়। এ আত্মবিশ্বাস ছিল না সেদিনের রুবির মুখে।

দলনেত্রী ওকে দলে নেবেন না জানে রুবি। সে নীরবে বলে, ছোটোবেলায় রূপকথার গল্প পড়তাম শুভম। সুয়োরনির দুর্বুদ্ধিতে প্ররোচিত হয়ে রাজা দুয়োরানিকে নির্বাসনে পাঠালেন। অশেষ দুঃখ ভোগ করে শেষে ছেলে-মেয়ের সাহায্যে দুয়োরানি আবার প্রাসাদে ফিরে এলেন। তারা সুখে ঘর করতে লাগলেন। সুয়োরানির শাস্তি হলো। ছেলেবেলা কিছু মনে হতো না। এখন বিস্ময় লাগে শুভম— দুয়োরানি কীভাবে সব ভুলে সুখে সংসার করতে লাগলেন। তার মনে হলো না, সুয়োরানি না হয় খারাপ, কিন্তু রাজা সেই বদ নারীর পরামর্শে তাকে ত্যাগ করেছিলেন কেন? রাজা কী সমান অপরাধী নয়?

সে যুগের দুয়োরানিরা কোনও প্রশ্ন করতেন না। সব অনাচার নিঃশব্দে মেনে নিতেন। একটা কবিতার কয়েকটি চরণ মনে এসেও যেন মনে পড়ছে না রুবির। সেই কবে কবিতাটি পড়েছে সে, হঠাৎ মনে পড়ে যায় :

"তুমি ভেবেছিলেন উন্মাদ করে দেবে?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মনে স্বেচ্ছাবর্ম লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্-খান্!

শরৎ মাধুরী লুট করে ফিরে—জয় জয় ট্রয়লাস।

উল্লাসে গায় পালে পালে ক্রীতদাস।

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণ প্লাবনে ভাসে

পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।

হায়নার হাসি আসে স্মৃতি পটে— বেহিসাবি ক্রেসিডাসে!

তুমি চলে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক

বধির ওষ্ঠাধরে।

তারপরে এল রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী।

কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু দুটি—

স্মরণ তোমায় হানে আজো তরবারি।"

ট্রয়লাসকে ঠকিয়েছিল ক্রেসিডা। নৈরাশ্যে ডুবে যেতে যেতে ট্রয়লাস ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতে গিয়েছিল। সেদিন নারীরা হয়তো এভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারত না। এ যুগে দুয়োরানিরাও বলে, "স্মরণ তোমায় হানে আজো তরবারি!" ■

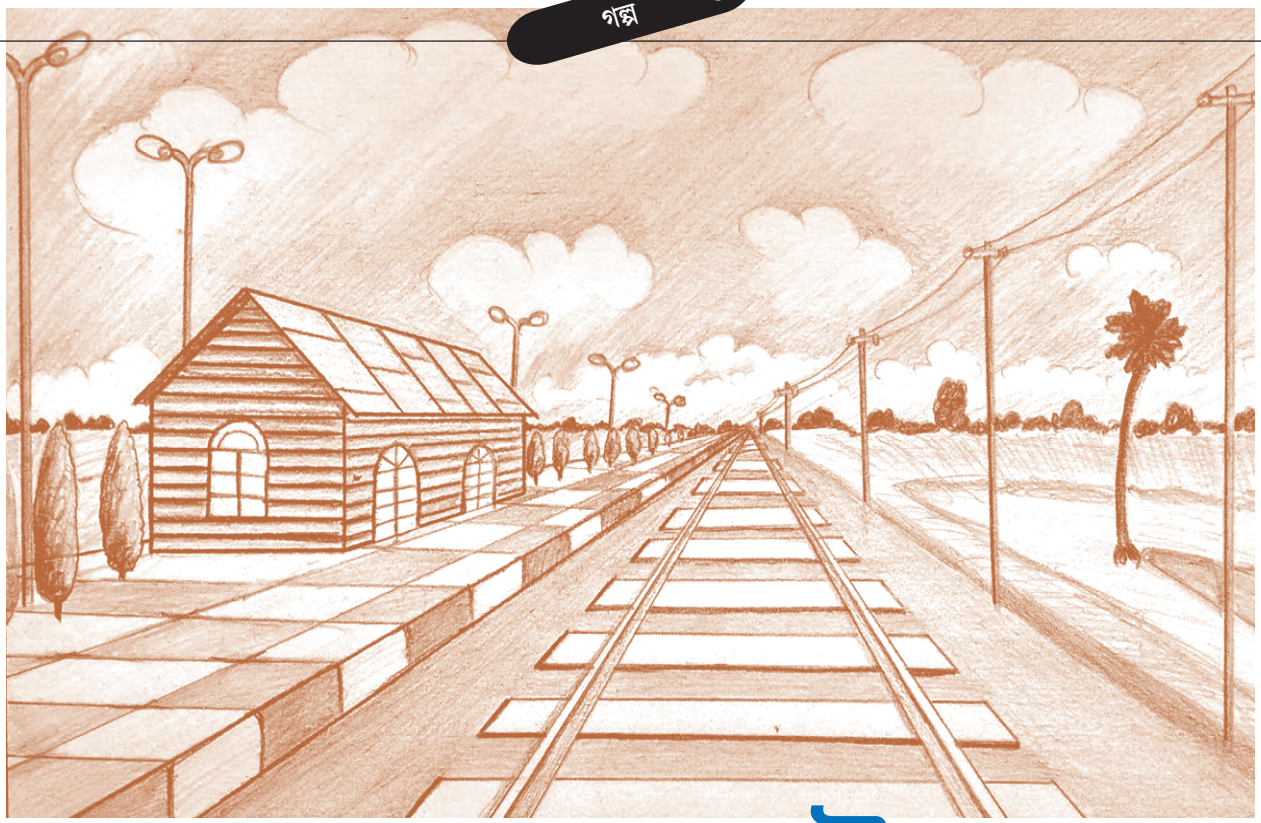

দুজন দলছুট

সন্দীপ চক্রবর্তী

—কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কথা! কী কথা?

—অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি আপনি প্ল্যাটফর্মে বসে আছেন। ট্রেন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি কোনও টেনে উঠছেন না। কী ব্যাপার বলুন তো?

—সে তো আপনিও বসে আছেন। কই আপনাকে দেখে আমার তো কোনও কৌতূহল হয়নি।

—আমার ব্যাপার আলাদা। আমি পুরুষমানুষ। আপনি মহিলা। বয়েসও এমন কিছু নয়। বড়োজোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ,

—কিছু মনে করবেন না, আপনি নেহাতই অসভ্য টাইপের মানুষ। বয়েস ঢের হয়েছে কিন্তু সহবত শেখেননি।

—যা ব্বাবা! আমি আবার কী অসভ্যতা করলাম?

—ওই যে! সুযোগ পেলেই মহিলাদের বয়েস জানার জন্য ছোঁকছোঁক করেন।

—সে আপনার ইচ্ছে না হলে বলবেন না।

—কেন বলব না? আমার বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ নয়। তার থেকে অনেক বেশি। আপনি আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের বেশি বড়ো হবেন না।

—ধ্যাৎ! আমাকে দেখতে এইরকম। কিন্তু মেঘে মেঘে বেলা বেশ গড়িয়েছে। পঁয়ষট্টি চলছে।

—তা হলে তো ঠিকই বলেছি।

—বলেন কী! আপনি ষাট? বিশ্বাস করুন অতটা লাগে না।

—থাক। অনেক হয়েছে।

—তা, কোথায় যাচ্ছেন সেটা কিন্তু এখনও বলেননি?

—কেন বলব? আপনি কি নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেছেন?

—ও এই কথা! আমার নাম অগ্নিদেব ব্যানার্জি। ব্যাঙ্কে চাকরি করতাম। এখন রিটায়ার্ড। বাড়ি কাছেই। বিয়ে করিনি। সুতরাং পেনসন যা পাই তাতে রাজার হালে চলে যায়।

—রাজার হালে যখন চলেই যায় তখন এই ভরসন্ধ্যেবেলায় ভূতের মতো প্ল্যাটফর্মে বসে আছেন কেন?

—এটা দারুণ বলেছেন। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর সেন্স অব হিউমার। কিন্তু ভূতের মতো কেন বসে আছি বলুন তো?

—সেটা তো আপনি বলবেন।

—ট্রেন দেখতে আমার দারুণ লাগে। কত রকমের ট্রেন নানা দিকে যাচ্ছে। মেল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন, লোকাল ট্রেন, গুডস ট্রেন। ট্রেনে কত ধরনের প্যাসেঞ্জার। আমিও তাদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি অনেক দূরে। তবে মনে মনে।

—মনে মনে কেন! সত্যি সত্যি গেলেই পারেন।

—গেছি তো। সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি। কিন্তু ইদানীং আর কোথাও যাই না।

—সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি, যান না কেন?

—ধুস! একা একা কি কোথাও যেতে ভালো লাগে? আপনি এখন বলবেন, বিয়ে যখন করেননি একা তো থাকতেই হবে। না, আমি ওই একাকিত্বের কথা বলছি না। এর আগেও তো আমি একলা কত জায়গায় গেছি। কখনও কোনও অসুবিধে হয়নি।

—তা হলে?

—আসলে, ইদানীং আর মানুষ পাই না। খুঁজি কিন্তু পাই না। আগে এরকম ছিল না। হয়তো দার্জিলিঙে গেছি। টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছি। হঠাৎ কেউ একজন চলে এলেন। কিংবা আমি চলে গেলাম কারও কাছে। গিয়ে বললাম, কী সুন্দর না! এই মানুষগুলো হারিয়ে গেছেন।

—ফেসবুকে পোস্ট করলেই পারেন।

—করি মাঝে মাঝে। কিন্তু তৃপ্তি পাই না। আমি যখন টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখছি, আমার ফেসবুকের বন্ধুরা তো তখন কলকাতায়। আমি বড়োজোর তাদের জন্য সানরাইজের একটা ছবি পোস্ট করতে পারি। কিন্তু ওই অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমার সাইলেন্ট হয়ে যাওয়া মনের কী ছবি দেব বলুন তো? ওটা একমাত্র তিনি অনুভব করতে পারবেন যিনি ওই বিশেষ দিনে টাইগার হিলে ছিলেন। এবং হঠাৎ কখন যেন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

—আপনি একটু ইয়ে টাইপ।

—কীয়ে টাইপ?

—না মানে, একটু অন্যরকম আর কী!

—মনের কথা যখন বলতে চান না, তখন জোর করব না। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছি সেটাই তো এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি। নিজের পরিচয়টা দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?

—দেওয়ার মতো পরিচয় আমার নেই। নাম বেলা মিত্র। হাউসওয়াইফ। ব্যাস, এইটুকুই।

—আপনার হাজব্যান্ডের নামটা কি জানতে পারি?

—রজত মিত্র।

—রজত মিত্র! ডাঃ রজত মিত্র নন তো?

—হ্যাঁ, তিনিই।

—আপনার হাজব্যান্ডকে আমি ভালোই চিনতাম। ওরকম লোক হয় না। ডাক্তার হিসেবে ওই লেভেলের নামডাক অথচ, বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। ওর অ্যাকাউন্ট ছিল আমাদের ব্রাঞ্চে। যখনই আসতেন ক্যান্টিনে ডেকে নিয়ে গিয়ে আড্ডা দিতাম। কোনওদিন বিরক্ত হননি। তাই ওর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে একজন কাছের বন্ধুকে হারাবার যন্ত্রণা পেয়েছিলাম।

—রজত মানুষটাই ছিল অন্যরকম। মেয়েরা শিবঠাকুরের মতো বর চায়। আমি চাই রজতের মতো। আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। ভগবানের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, প্রত্যেক জন্মে যেন আমি রজতকে পাই।

—বুঝতে পারছি, আপনি এখনও শোক থেকে বেরোতে পারেননি।

—কোনওদিন পারবও না। আসলে কী জানেন, শোক শুধু শূন্যতা রেখে গেলে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু যে শোক জীবনের ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়ে গেছে তাকে আপনি ভুলবেন কী করে? রজত নেই মানে আমিও নেই। তাই মনে করার চেষ্টা করি ও আছে। কাছেপিঠে কোথাও গেছে। এক্ষুণি বেলা বলে ডাকবে। সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি।

—আপনাদের ছেলে-মেয়েরা তো শুনেছি দুজনেই বিদেশে সেটলড।

—হ্যাঁ। ছেলে টেক্সাসে। আর মেয়ে লন্ডনে।

—আপনি তো ওদের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন।

—থেকেছি কয়েকবার। ভালো লাগেনি। বিদেশে থাকতে আমার ভালো লাগে না। রজত থাকতে ইউরোপ ট্যুর করেছি। আমেরিকা গেছি, জাপান গেছি। কিন্তু স্থায়ীভাবে বিদেশে থাকার কথা ভাবিনি। রজত বলত, আমাদের একটা সুন্দর দেশ আছে বেলা। শুধু টাকা রোজগার করার জন্য আমি সেই দেশ ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারব না।

—বাহ্!

—দুঃখটা কোথায় জানেন, রজতের এই আদর্শ আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ নিল না। আমি ওদের অনেকবার দেশে ফিরে আসার কথা বলেছি। ওরা বলে, ইন্ডিয়ায় কোনও প্রসপেক্ট নেই। পলিটিক্স আর কোরাপশনে শেষ হয়ে গেছে দেশটা।

—উত্তেজিত হবেন না মিসেস মিত্র। ওরা ওদের মতো থাক না।

—আমি তো ওদের জীবনযাপনে কোনও বাধা দিইনি। থাক না ওরা ওদের মতো। কিন্তু আমি ওদের মা। আমার প্রতি কি ওদের কোনও দায়িত্ব নেই? বিশেষ করে এই প্রশ্ন আমি করতে চাই আমার ছেলের কাছে। রনি আজকাল কলকাতায় আসেই না। ফোন করলে দায়সারা ভাবে উত্তর দেয়। আমি কি ওর কেউ নই?

—সেই অভিমানেই বুঝি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিলেন?

—না, ঠিক চলে যাচ্ছিলাম না। আসানসোলে আমার বাপের বাড়ি। শান্তিনিকেতনেও আমাদের একটা বাড়ি আছে। চেঞ্জের জন্য কোথাও একটা যেতাম হয়তো।

—গেলেন না তো?

—যাওয়া হলো না। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথা বলে মনটা এখন বেশ হালকা লাগছে।

—থ্যাঙ্ক গড! আসলে কী জানেন মিসেস মিত্র, প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা ছন্দ আছে। আমাদের প্রতিটি সম্পর্ক সেই ছন্দের মাত্রা। এখনকার জীবন একমাত্রিক। তাই মাত্রা ঠিক রাখার জন্য বহু সম্পর্ক বাদ দিতে হয়। বাবা মা সেরকম দুটো বাড়তি সম্পর্ক।

—বাবা মা বাড়তি! কী বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ, মিসেস মিত্র। সন্তান যাতে বৃদ্ধ বাবা মার দেখাশোনা করে তার জন্য আইন করার কথা ভাবছে বিহার গভর্নমেন্ট। খবরটা শুনেছেন কি?

—শুনিনি কিন্তু খবরটা তো ভালোই। আইন থাকলে শাস্তিও থাকবে। আর শাস্তির ভয়ে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা বুড়ো বাবা মাকে অবহেলা করতে পারবে না।

—তা পারবে না। কিন্তু যে দায়বদ্ধতা মানুষ শাস্তির ভয়ে পালন করে তা কি শেষপর্যন্ত দায়বদ্ধতা থাকে? আমার তো মনে হয় অভ্যেসে পরিণত হয়। শ্রদ্ধাহীন সেবাও একধরনের অবহেলা।

—কী জানি! আমার শুধু মনে হয় এই একাকিত্ব একটা অভিশাপ। খুব অভিমান হয়। কী অপরাধ করেছি আমি যে এমন একটা জঘন্য অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হবে? আজকাল রাতে প্রায়ই ঘুম আসে না। দৈবাৎ যদি আসে আজেবাজে স্বপ্ন দেখি। কান্না পায়। এক-এক দিন আমি শুধু কাঁদি। ইচ্ছে হয় সব শেষ করে দিই। এই জীবন, এই যন্ত্রণা সব।

—বালাই ষাট! শেষ করবেন কেন? শুরু করুন।

—ঠাট্টা করছেন! এই বয়েসে কী শুরু করব?

—ইগনোর করা শুরু করুন। ছেলের উপেক্ষাকে ইগনোর করুন। মেয়ের স্বার্থপরতাকে ইগনোর করুন। দেখবেন, ইগনোর করতে পারলেই ক্ষমা করতে পারছেন। আর ক্ষমা করতে পারলে ভুলতেও পারবেন।

—এসব কথা মুখে বলা সহজ। করা খুব কঠিন। বিয়ে করেননি তো, আপনি ঠিক বুঝবেন

না।

—বিয়ে করিনি মানে কি আমি ভালোবাসতে পারি না মিসেস মিত্র? টবের গোলাপগাছে সময়মতো কুঁড়ি না এলে আমার খুব চিন্তা হয়। তারপর ধরুন মুন্নি, আমার পোষা বেড়াল। সে যদি মনমরা হয়ে থাকে আমার রাতে ঘুম আসে না। কত কী ভাবি! এরা ছাড়া আছে বাদল মাস্টার। টেনে বাঁশি বাজিয়ে ভিক্ষে করে। স্বপ্না বসু। অসাধারণ গান গায়। এক হঠাৎ প্রেমিকের প্রস্তাব মানেনি বলে সে অ্যাসিড বালব ছুঁড়ে স্বপ্নার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কী! স্বপ্না এখন বেনারসে। ভোরবেলায় গান গেয়ে মহাদেবের ঘুম ভাঙায়। আবার রাতে ঘুম পাড়ায়। আর বাড়িতে এলে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে, আমি আগের থেকে দেখতে একটু ভালো হয়েছি না? এদের নিয়ে আমার সংসার মিসেস মিত্র।

—সরি! আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি পুরুষ। আপনাদের ভালোবাসায় কোনও ঘরবার নেই। আমরা মেয়েরা ভালোবাসি ঘর বাঁধার জন্য। সন্তানের জন্ম দিই ঘরকে আরও বড়ো করার জন্য। সন্তানের উপেক্ষা তিল তিল করে গড়ে তোলা সেই ঘর মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে দেয়।

—একজনের উপেক্ষায় ঘর ভাঙবে কেন মিসেস মিত্র? ঘর তো আপনার বড়ো। সেখানে কি ঘরের বাইরের কাউকে ডেকে নেওয়া যায় না?

—ছি ছি লোকে কী বলবে!

—আমার বাদল মাস্টার কী বলে জানেন? বলে, খাইতে না পাইলে যারা আমায় খাওয়াইব না পরাইব না, তাদের কথায় কী আসে যায়! রূপারে আমি কইয়া দিসি, তুই বেবুশ্যে ছিলিস তো কী? অহন থাইক্যা তুই আমার বউ। আমি বাজাব আর তুই বাজাবি।

—কিন্তু আপনার বাদল যা পারে আমি কী করে পারব মিস্টার ব্যানার্জি? সোসাইটিকে ইগনোর করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

—সোসাইটি আর সোশ্যাল এভিল এক জিনিস নয় মিসেস মিত্র। মুশকিলটা কোথায় জানেন? আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে আমরা কিছু শিখি না। অথচ ওদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

—কী শিখব?

—দেখবেন ওদের যে কোনও সম্পর্কের ভিত্তি হলো বন্ধুত্ব। যে কারণে ওদের সম্পর্কগুলো এত সরল। এই একজনের সঙ্গে

ব্রেক আপ হলো তো দু'মাস পর আর একজনের প্রেমে পড়ে গেল। অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে ওদের কোনও আবেগ নেই। বাট আই উওন্ট এগ্রি। নেভার। আবেগ আছে। কিন্তু সেই আবেগ ওদের ইনার্ট করে দেয় না। ওদের কাছে প্রেম মানে একসঙ্গে চলা। সেই চলা একদিনের জন্যেও হতে পারে এক জীবনের জন্যেও হতে পারে। চলতে চলতে রাস্তা আলাদা হয়ে গেলে নো প্রবলেম। কিছুদিন একা। তারপর আবার কারও ডাক। বন্ধন আছে কিন্তু শৃঙ্খল নেই। অতীত আছে কিন্তু অতীতে আটকে যাওয়া নেই। সারা জীবন কালকের দিনটার জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট আছে মিসেস মিত্র। কথাটা আমরা মানি না। মানতে পারলে আমরা শুধু বড়ো হতাম, বুড়ো হতাম না।

—খুব ভালো লাগছে জানেন। মনে হচ্ছে জীবনের এখনও কিছুটা বাকি আছে। কিন্তু আমার মতো একজন সংসারী মানুষের এরকম মনে হওয়া কি স্বাভাবিক?

—নিজের দিকে তাকানো, নিজের কথা ভাবা, নিজেকে একটু ভালোবাসা অস্বাভাবিক হবে কেন?

—আপনি কি রোজই এখানে আসেন?

—সাড়ে ছ'টা নাগাদ এলেই আমাকে পাবেন।

—আমি যদি মাঝে মাঝে আসি?

—মাঝে মাঝে কেন, রোজই আসুন না। বেশ আড্ডা হবে।

—লোকে যদি কিছু বলে?

—বলবেন আমরা একট ক্লাব করেছি। ক্লাবের নাম দুজন দলছুট।

—ধ্যাত।

—আপনার আসানসোল যাবার ট্রেন আসার সময় কিন্তু হয়ে গেল।

—থাক। আজ আর যাব না।

—সে কী! যাবেন না কেন?

—ফিরে আসার চেষ্টা করে একবার দেখি না। যদি না পারি তখন না হয় যাওয়া যাবে। ▮

গল্প

একদিন পিঙ্কু

আজ ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষ্যে স্কুল ছুটি। শ্রীমান দ্বৈপায়ন বসু হোমটাস্কের অঙ্কগুলো করছিল। ওর ডাকনাম পিঙ্কু। পিঙ্কু পড়ার টেবিলের সামনের জানালাটা দিয়ে তাকালো

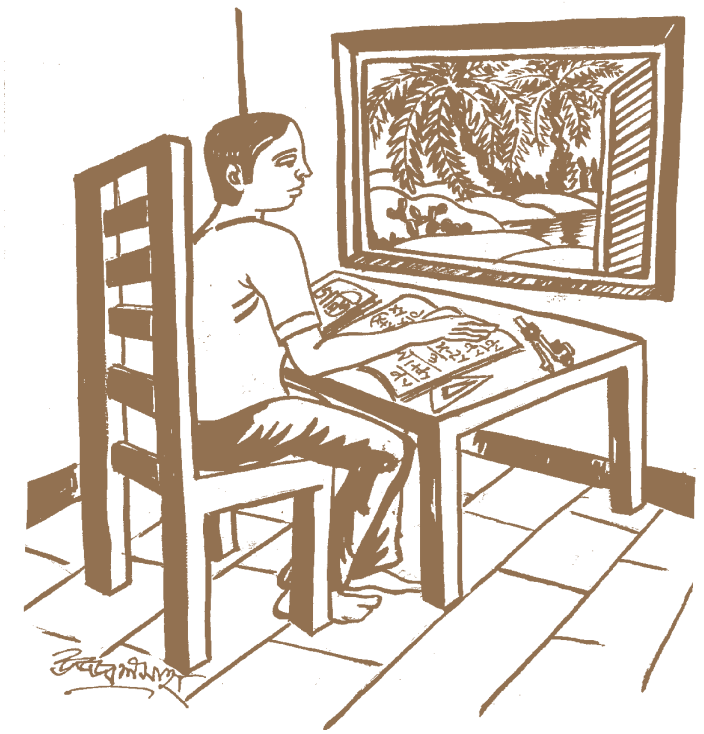

বাইরের দিকে। নতুন গড়ে ওঠা পাড়া। চারদিকে সুন্দর বাড়ি। পিঙ্কুদের মতো অনেকেই এখানে নতুন বাড়ি করেছে। মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে রাস্তা। মাঝে মাঝে দু'একটা ফেরিওয়ালা যাচ্ছে। পিঙ্কু একবার বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়েই আবার চোখ রাখলো বাইরের দিকে। কিন্তু একী দেখছে ও। চেনাশোনা সমস্ত দৃশ্যই যেন এক নিমেষে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। তার বদলে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে নতুন অন্য এক ছবি। চারদিকে ধু ধু বালি। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে জল। ভালো করে চোখ রগড়ে আবার দেখে সেই একই দৃশ্য। চিৎকার করে মাকে ডাকলো পিঙ্কু। মা তখন রান্নাঘরে। পিঙ্কুর চিৎকার শুনে মা তাড়াতাড়ি ছুটে এল। পিঙ্কু বলল, 'মা মা তুমি কি দূরে গাদা গাদা বালি আর মাঝে মাঝে জল দেখছ? বাড়িঘর রাস্তা হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেল মা। 'এ তুই কী বলছিস পিঙ্কু? কোথায় বালি? কোথায় জল? ওই তো রিনা মাসিদের বাড়ি, পার্ক, রাস্তা'– কাঁদো কাঁদো শোনায় পিঙ্কুর মায়ে গলা। বললেন, ' রাতে ভালো ঘুম হয়নি কিংবা দুপুরে ভালো করে স্নান করা হয়নি, তাই এসব ভুলভাল কথা মনে হচ্ছে।' একটু পরেই পিঙ্কু স্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে পেল। অদ্ভুত বিস্ময়ে সেকথা মাকে বলল পিঙ্কু। মা বললেন, 'এসবই তোর চোখের ভুল।'

পিঙ্কুর মায়ের মাথা থেকে কিন্তু চিন্তাটা গেল না। বিকেলে বাড়ি ফিরে পিঙ্কুর বাবা জলখাবার খেয়ে যখন বারন্দায় বসলেন, তখন তাঁকে এ ব্যাপারটা জানালেন পিঙ্কুর মা। সব শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি আমার বন্ধু দীপনারায়ণের কাছে আজ সন্ধেবেলায় যাব। ওর নানা বিষয়ে জ্ঞান আছে। অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করে। দেখি ও যদি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারে।

দীপনারায়ণ একটি বড়ো কলেজের অধ্যাপক। পিঙ্কুর বাবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পিঙ্কুর বাবা বললেন, একটা ব্যাপারে এসেছি ভাই। তুমি যদি কিছু বলতে পারো। সব শুনে দীপনারায়ণবাবু বললেন, ' ব্যাপারটা আমার মনে হয় পিঙ্কুর কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা রয়েছে। যার ফলে ও হঠাৎই অতীতের খণ্ডচিত্র দেখতে পায়। এ সম্পর্কে আমি বিভিন্ন জার্নালে অনেক আর্টিকল পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমার ছেলে দেখতে পেয়েছে সেই ছবি– সল্টলেক উপনগরীর জন্মলগ্নের অনেক আগে ওখানে যা যা ছিল– ধু ধু বালিয়াড়ি আর মাঝে মাঝে জল।' অপার বিস্ময়ে পিঙ্কুর বাবা সুধাময় বললেন, 'ঠিক বলেছ ভাই, এটা তো আমার জানা ছিল না। সাধুসন্তদের কাছে অনেক এরকম ঘটনা শোনা যায়।' দীপনারায়ণ বললেন, 'নবদ্বীপের রাস্তায় পাঁচশো বছর আগেকার শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কীর্তনের দল আসতে দেখেছিলেন বহুবছর পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ১৯৪২ সালর ১৯ আগস্ট নর্মান্ডির ডিয়েপে বন্দরে কানাডা ও ব্রিটেনের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে বহুবছর পরে এক মহিলা পর্যটক শুনেছিলেন গুলি বোমার শব্দ, লক্ষ মানুষের আর্তনাদ, এয়ারক্র্যাফ্টের প্রবল শব্দ। পুরনো নথিপত্র থেকে জানা গিয়েছিল, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধবিরতির সময়সীমা সব কিছুই সঠিক ভাবে ধরা পড়েছিল ওই মহিলার অনুভূতিতে। এত বোঝা যায় অতি বিরল হলেও সাধারণ মানুষের কারো কারো মধ্যে এই জাতীয় অনুভূতি থাকে। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষমতা হারিয়েও যায়।'

সব শুনে পিঙ্কুর বাবা সুধাময় বললেন, সেটাই ভালো। না হলে না হলে সমাজ সংসারে থাকা সাধারণ মানুষ এই আপাত অস্বাভাবিক অনুভূতির মধ্যে পড়ে পাগল হয়ে যেতে পারে। পিঙ্কুরও এই অনভূতি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে মনে হওয়ায় সুধাময়ের খুবই ভালো লাগলো। চা-পর্ব শেষ করে দীপনারায়ণকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সুধাময় বাড়ির পথ ধরলেন।

রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

কুশীনগর

বৌদ্ধ তীর্থ কুশীনগর। স্থানীয় মানুষরা মাথা কুয়র বা কোট বলে থাকে। ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে হিরণ্যবতী নদী তীরে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যে হিউয়েন সাং বর্ণিত কুশীনগর মহাতীর্থ আবিষ্কৃত হয়ছে। পরিনির্বাণ চৈত্যের একটি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। পাওয়া গেছে কাঠকয়লার পাত্র, কড়ি, বহুমূল্যবান শিলা, স্বর্ণমুদ্রা, বৌদ্ধবিহার ও নানান স্তূপ। রয়েছে নির্বাণ মন্দির ও মুকুট বন্দনা স্তূপ। মন্দিরে রয়েছে বার্মিজ ভক্ত লহরিবালার নির্মিত ২০ ফুটের বেশি লম্বা ডান পাশে ফিরে হাতের চেটোয় মাথা রেখে অন্তিম শয়নে শায়িত ভগবান তথাগত। নির্বাণ মন্দিরের পিছনে নানান ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। রয়েছে চীনা, বার্মিজ ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ মন্দির। মিউজিয়ামে রয়েছে অতীত সংগ্রহ। জাপানি ভক্তরা সাঁচীর আঙ্গিকে স্তূপ গড়েছে কুশীনগরে। রয়েছে ব্রোঞ্জ ও ইস্পাতের তৈরি বিশাল মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি।

জানো কি?

- পঞ্চামৃত— দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।
- পঞ্চতত্ত— অগ্নি, পৃথ্বী, জল, বায়ু, আকাশ।
- পঞ্চযজ্ঞ— ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, অতিথি, ভূতযজ্ঞ।
- পঞ্চেন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।
- পঞ্চকোষ— অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।
- ছয়ঋতু— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।
- ছয় বেদাঙ্গ— শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ , নিরুক্ত।
- ছয় দর্শন— ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত।

ভালো কথা

বিকল্প প্লাস্টিক

গত ২ অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিনে ভারত সরকার সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। নিন্দুকরা বলছে তাহলে তো খুবই অসুবিধা হবে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন ইজরায়েলি মহিলা বিজ্ঞানী শ্যারন বারাক। তিনি দীর্ঘদিনের গবেষণায় বিকল্প প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন এই বিকল্প প্লাস্টিক এক মিনিটেই গলে জল হয়ে যাবে, মিশে যাবে মাটিতে। তিনি বলেছেন এই প্লাস্টিক ব্যবহারের পর যে কেউ অবলীলায় এটি ছুড়ে ফেলতে পারেন অথবা ফেলে দিতে পারেন নর্দমায়। পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না। ১০০ শতাংশ এটি পরিবেশ বান্ধব। নিসন্দেহে এটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা সারা পৃথিবীকে এক অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই প্লাস্টিক বাজারে কবে আসবে তা এখনো সরকারি ভাবে জানানো হয়নি। তবে যতদিন না আসছে আমাদের কাপড়ের ব্যাগের থলে নিয়েই বাজারে যেতে হবে।

সুনন্দা সান্যাল, দ্বাদশ শ্রেণী, গোরাবাজার,বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রতিজ্ঞা

উদয়ন মহান্তি, ষষ্ঠ শ্রেণী, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

প-য়ে প্লাস্টিক
ব্যবহার করা কি ঠিক?
থ-য়ে থার্মোকল
মানুষের জীবন করেছে বিকল।

ভালো করে ভেবে ভেবে
প্রতিজ্ঞা যে নিতে হবে।
তা না হলে—
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১১।।

বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজরা জিতল। ভারতে নিরাশা ছেয়ে গেল। ডাক্তারজী পুণা গেলেন, দেশের অবস্থা নিয়ে কথা বললেন লোকমান্য তিলকের সঙ্গে।

সেখান থেকে ডাক্তারজী গেলেন শিবাজীর জন্মস্থান শিবনেরি দুর্গে। দুর্গের দুর্দশা দেখে তাঁর দুঃখ হলো।

১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হতে চলেছে। ডাক্তারজী তার সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও অধিবেশন ডাকলেন।

ডাক্তারজী কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধান ব্যবস্থাপক রূপে কাজ করলেন।

ক্রমশ

জেহাদি তিতুমিরকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানানোর কৃতিত্ব বাম-ইসলামিক ইতিহাসবিদদের

অভিমন্যু গুহ

তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার ও তার বীরত্বের গল্পগাথা বাম আমলে অবশ্য পাঠ্য ছিল, এখনও বোধহয় আছে। তবে বাম আমলে এর প্রভাবটা ছিল আরও মারাত্মক। শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তোলাটা ছিল সিপিএমের ক্ষমতা দখলের অন্যতম ছক। ভূমিরাজস্ব সংস্কারের নামে বর্গাদার উচ্ছেদ করে ক্ষেতমজুর, চাষির ক্ষমতায়ন আসলে ছিল পার্টির দখলদারি। সত্যিই যদি বর্গাদার উচ্ছেদ করা যেত, নিরন্ন চাষি, ক্ষেতমজুরের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দেওয়া যেত, তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষই লাভবান হতেন। কিন্তু এই ছলে পার্টির সর্বকর্তৃত্বময় হয়ে ওঠার ইতিহাস সবাই জানেন, নতুন করে বলার দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে অবান্তরও, কিন্তু যাকে সামনে রেখে কৃষক-বিদ্রোহের ছক কষেছিল শাসক সিপিএম তাঁর নাম সৈয়দ মির নাসের আলি, যাকে 'তিতুমির' বলেই সবাই জানে। এই 'হিরো'টিকে 'স্বাধীনতা-যোদ্ধা' হিসেবে তুলে ধরতে আগমার্কা বাম-ঐতিহাসিকদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কেবল এটাই নয়, ১৮৩১ সালে বারাসতের কাছে নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমিরের বাঁশের কেল্লায় 'ব্রিটিশ অবরোধ' ও লড়াইকে 'প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলেও দাগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা।

অথচ এর ছাব্বিশ বছরের মধ্যে ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ দেখা যায়, যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে তাদের শাসন ব্যবস্থা গোটাতে বাধ্য হয়, দীর্ঘদিন

জেহাদি তিতুমির আধুনিক কালে বাম ঐতিহাসিকদের পাল্লায় পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন বটে, তবে ইতিহাসের সত্য চাপা থাকে না। ... এ বাংলার জামাত 'পক্ষ' যেমন এখন বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর আরবীয় সংস্কৃতি চাপাতে চাইছে, ওপার বাংলায় সেই সার্থক প্রয়াস 'বাঙ্গালি' সেন্টিমেন্টের ধুয়ো তুলে বহু আগেই গৃহীত হয়েছে। বামৈস্লামিক ইতিহাসবিদদের এতে অবদান ইদানিংকালের জামাত 'পক্ষে'র অনেক আগে।

বাম-ঐতিহাসিকরা বিষয়টিকে 'সিপাহি যুদ্ধে'র বেশি মর্যাদা দেয়নি। বীর সাভারকার সর্বপ্রথম এই তথাকথিত 'সিপাহি যুদ্ধ'কে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে'র মর্যাদা দেন। হঠাৎ করে এই ২০১৯-এ এসে বামৈস্লামিক শক্তি আবিষ্কার করল এটা নাকি মার্কস সাহেবের কাজ। শেষ শয্যায় মার্কস যথার্থই বলেছিলেন : 'ধন্যবাদ ভগবান, আমি মার্কসবাদী নই।'

এইসব 'ভক্ত' ঐতিহাসিকদের ভক্তির গল্পগাছা সরিয়ে রেখে প্রকৃত ইতিহাসটা জনসমক্ষে উঠে আসা উচিত। নইলে ব্রিটিশের গোলাম, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া, স্বাধীন ভারতে চীন-পাকিস্তানের দালালি করা কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-ও 'মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী' হয়ে যাবে।

কোনও সন্দেহ নেই ১৮৩১ সালের ১৮ নভেম্বর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা অবরোধ করে। তার পরেরদিন ঘণ্টা তিনেক গুলির লড়াই হয়, কিছু সঙ্গী-সাথী নিয়ে তিতু মারা যায়। তার বাঁশের কেল্লা ব্রিটিশ সেনা দখল করে। তিতুর শ'খানেক লোক বন্দি হয়। এই অবধি ইতিহাসের পাঠ সাদা দৃষ্টিতে ঠিকই আছে। কিন্তু শয়তান মস্তিষ্ক, ধূর্ত বাম ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াইয়ের সূত্র ধরে তিতুমিরকে 'মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী' বানিয়ে দিয়েছে। তিতুর সম্পর্কে সামান্য যে

ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় তা মূলত জন রাসেল কোলভিনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে। কোলভিন ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট। তাছাড়া ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লেফট্যানেন্ট গভর্নরও ছিলেন তিনি।

কোলভিন যদি কোনও ঐতিহাসিক হতেন তাহলে তাঁর বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ করা চলত। কিন্তু একজন রাজকর্মচারী হিসাবে সমসাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি তিতুর সম্পর্কে জেনেছিলেন, এখানে ঐতিহাসিক মত প্রকাশের সুযোগ নেই। তাই কোলভিনের রিপোর্টের সত্যতা আছেই। কোলভিন জানিয়েছেন, তিতুর জীবন শুরু হয়েছিল সামান্য এক কৃষক হিসেবে। এই অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকার ইচ্ছা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তিতুর ছিল না। সে একটা ডাকাতের দল গড়ে, লুটপাঠ চালাত। পাঠক, 'স্বদেশি ডাকাত' যাঁরা দেশের উন্নতির জন্য, দশের উন্নয়নে তথাকথিত 'ডাকাতি' করেছিল, এই ধারণা অনেক পরে এসেছিল, তিতুর সময় নয়। আর এই 'স্বদেশি ডাকাত'রা ছিলেন মা কালীর পূজারি হিন্দু। তিতুর লুঠপাঠ শুধুমাত্র তার বিত্তবাসনা মেটানোর জন্য।

এক সময় সে কলকাতায় আসে, কুস্তিগির হিসেবে তার নাম-ডাকও হয়। সে এক জমিদারের লেঠেল নিযুক্ত হয়। এদের কাজ ছিল ধমকিয়ে-ধামকিয়ে অন্যের জমির দখল নেওয়া। তিতু ছিল এই কাজে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু একবার এই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে সে। ঠাঁই হয় কোম্পানির জেলে। অপরাধ-প্রবণতায় আরও বড়ো ধরনের হাত পাকায় সে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে 'তীর্থ' করতে মক্কায় চলে যায় সে। সেখানে সৈয়দ আহমেদের শিষ্যত্ব নেয়, ভারতে ফিরে আসে একজন ইসলামিক ধর্মপ্রচারক হিসেবে।

মক্কার জল-হাওয়া তিতুমিরকে একজন এমন 'ধর্মপ্রাণ' মুসলমান করে তুলেছিল, যাতে করে ভারতের বাউল-সন্ত-সুফি সাধনা থেকে সে অনেকদূর চলে যায়, চরম হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমান সাম্প্রদায়িক ওয়াহাবি আন্দোলনে নিজেকে দীক্ষিত করে। ইংরেজদের হাত থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্ম হয় আরবের রুক্ষ ভূমিতে এবং সৈয়দ আহমেদ রাই বারেলভির হাত ধরে তা পদার্পণ করে ভারত-ভূমিতে। একথা স্পষ্ট বোঝা দরকার এই ওয়াহাবি আন্দোলনই নানা প্রক্রিয়ায় (যার মধ্যে অন্যতম খিলাফত আন্দোলন) শেষপর্যন্ত আরবের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের একাত্ম করে এবং 'পাকিস্তান' প্রসঙ্গের জন্ম দেয়। সেইদিক দিয়ে দেখলে আজকের নিরিখে তিতুমির ছিলেন একজন ধুরন্ধর জেহাদি, যাকে 'দেশপ্রেমী' বানানোর বামৈস্লামিক ষড়যন্ত্র আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

তিতুমিরের গুরু সৈয়দ আহমেদ অনেক কষ্ট করে ওয়াহাবি আন্দেলনের বিষ বৃক্ষটি পুঁতেছিলেন এবং এই জেহাদি সংগ্রামে তিতুমির ছিল তাঁর প্রধান সেনানি। এই সৈয়দ আহমেদ রাই বারেলভির চিন্তাধারা যে আজকের দিনের ব্যাপক জেহাদের জন্মদাতা তা স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন উত্তর ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে মারাঠা ও উত্তর-পশ্চিমে শিখ শক্তি এবং শ'খানেক হিন্দু নিয়ন্ত্রিত প্রিন্সলি স্টেট মুসলমানদের ধমকে লঘু করে দিচ্ছে, সুফি-বাউল প্রভাব বাড়াচ্ছে, আরবীয় সংস্কৃতি মোগল প্রভাব থেকে মুসলমানদের বিরত করে 'স্বধর্ম'চ্যুত করছে। ফলে ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা।

ইংরেজ শাসন ও মুসলমান শাসন— উভয়েই ভারতকে লুঠ করতে সক্রিয় ছিল, এবং এই দুই বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষের মূল অধিবাসী হিন্দুদের ধর্মনাশ, রাজ্যনাশ, সর্বনাশের মূলে ছিল। তাই তিতুমির বনাম ইংরেজ শক্তির লড়াই ছিল আদতে রাজায় রাজায় যুদ্ধ এবং এর মাশুল গুনেছিল উলুখাগড়া হিন্দুরা। সৈয়দ আহমেদের বাণী ছিল : 'মুসলমান রাজ্য যখন কাফেররা দখল করে, তখন জেহাদ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, ইসলামিক উম্মাহদের কাছেও।'

১৮২৭ সালে তিতুমির মক্কা থেকে বাঙ্গলায় ফিরে আসার পর ইসলামের বাণী প্রচারের নামে মুসলমানদের (যাদের প্রজন্ম এককালে হিন্দু ছিল, মোগল আমলে মুসলমান হয়ে প্রাণ বাঁচায়) জেহাদ তত্ত্বে দীক্ষিত করে এবং জনজাতি মানুষকেও ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে মুসলমান বানানোর ছক কষে। এই মুসলমানত্ব প্রমাণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে তিতু বেছে নিয়েছিল হিন্দু মন্দিরগুলো আর তাদের সেবায়েত পুরোহিতদের। কালাপাহাড়ি মেজাজে তিতুর তাণ্ডবে চব্বিশ পরগনা, হুগলি প্রভৃতি জেলার অসংখ্য মন্দির ভাঙা পড়ে, কত যে পুরোহিত খুন হয় তার ইয়ত্তা নেই। এর সঠিক পরিসংখ্যান কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু কোলভিনের মতো সরকারি আমলাদের রিপোর্টে তার আভাস পাওয়া যায়।

জেহাদি তিতুমির আধুনিক কালে বাম ঐতিহাসিকদের পাল্লায় পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন বটে, তবে ইতিহাসের সত্য চাপা থাকে না। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ইসলামিক জেহাদের আঁতুড়ঘর, জামাত গোষ্ঠীর জন্মদাতা, যারা ইদানীং কালে পশ্চিমবঙ্গের কিছু হিন্দু নামধারী মুসলমানকে তাদের মুঠোয় নিয়ে এসেছে সেই মৌলবাদী দেশটির তিতুমির ভক্তির নমুনা শোনা দরকার।

১৯৭১ সালের ঢাকার জিন্না কলেজ, তিতুমিরের নামে নামাঙ্কিত হয়। 'মুক্তিযুদ্ধে'র বছরে উত্তরপুরুষ ছেড়ে পূর্বপুরুষে তর্পণ আর কী! ঢাকার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির একটি কক্ষ তিতুমিরের নামাঙ্কিত হয়। খুলনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি বন্দরও তিতুমিরের নামে। তিতুমিরকে সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার তার নামে একটি স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করেছে।

ফলে বিষয়টা আশা করি স্পষ্ট হচ্ছে এ বাঙ্গলার জামাত 'পক্ষ' যেমন এখন বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর আরবীয় সংস্কৃতি চাপাতে চাইছে, ওপার বাংলায় সেই সার্থক প্রয়াস 'বাঙ্গালি' সেন্টিমেন্টের ধুয়ো তুলে বহু আগেই গৃহীত হয়েছে। বামৈস্লামিক ইতিহাসবিদদের এতে অবদান ইদানীংকালের জামাত 'পক্ষে'র অনেক আগে। ■

বল্লভভাই প্যাটেল অবহেলিত দেশনায়ক

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩১ অক্টোবর ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্তকে তাঁর চরণে সমর্পণ করেছেন। এখন উচ্চ প্রযুক্তির ফোনের সুবাদে সারা বিশ্বব্যাপী মোটামুটি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু, কর্মকাণ্ড একটু নাড়াচাড়া করলেই পাওয়া যায়। তাই সেগুলো সকলেরই জানা। আলাদা কিছু জানার সুযোগ থাকে domain expart বা বিষয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ প্যাটেল বিষয়ে একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করেছিল। স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা আজাদেরই এক সময়ের কলকাতার বসতবাড়িতে যা আজ তাঁর নামাঙ্কিত সংগ্রহশালা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. রাজশেখর বসুই ছিলেন অনুষ্ঠানের একক বক্তা। প্রাক স্বাধীনতা পর্বের দীর্ঘ আন্দোলন ও স্বাধীনতা-পরবর্তী নবীন একটি জাতির নিজেকে সংহত করে বিশ্বের দরবারে উপযুক্ত করে তোলার সময়টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্যাটেল। কিন্তু তাঁর সমকালীন অনেক সহযোগীকে ঘিরেই একটা অতি মানবীয়তা বা 'মিথ' তৈরির চেষ্টা হয়েছে। প্যাটেলকে নিয়ে সে প্রচেষ্টা হয়নি। তাই তাঁর জাতির কল্যাণে নেওয়া সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলিকেও কখনও জনসমক্ষে আসতে দেওয়া হয়নি। এতে মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে জানার অধিকার থেকে দেশবাসী বঞ্চিত হয়েছে। ড. বোস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, এর মূলে ছিল কেবলমাত্র একটি পরিবারকেই 'ফোকাসে' রাখার অপচেষ্টা। তখনই প্রবাদ পুরুষ হয়ে ওঠা মহাত্মা গান্ধীও এ বিষয়ে মাথা ঘামাননি।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কারণে নেতারা একে অপরের প্রতি সৌজন্যবোধ কখনই হারিয়ে ফেললেন না। প্যাটেল যখন কৃষকদের দাবিতে বরদোলি সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন তিনি পুরোদস্তুর কৃষকনেতা। কিন্তু ১৯৩৫ সালে সারা ভারত কিষানসভা তৈরি হওয়া ও ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর জমিদারদের হটিয়ে দেওয়া নিয়ে কংগ্রেসের বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের সঙ্গে প্যাটেল একমত হতে পারেননি। পরবর্তীকালে সোভিয়েত মডেল নিয়ে নেহরুর Pseudo socialist policy-তেও তাঁর ভিন্নমত ছিল। সোভিয়েত মডেল অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের তিনি বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু এই মডেলে যেহেতু সবটাই রাষ্ট্রের

তরফে খরচা হয়ে যায়, তাই পাশাপাশি সঞ্চয় বাড়াতে তিনি বেসরকারি শিল্পদ্যোগের ওপরও সমান গুরুত্ব দিতেন। আজকের সারা বিশ্বে ব্যবসায়িক লেনদেনে লিপ্ত গুজরাট মিল্ক কোঅপারেটিভের পরিচালনায় 'আমুল ব্রান্ডটি' ৩৮ হাজার কোটি টাকার যে অর্থনীতি পরিচালনা করছে তার সূচনাকর্তা ছিলেন ৭০ বছর আগে এই প্যাটেলই।

দেশে মানুষের স্বল্প খরচে বাসস্থানের সমস্যা মেটাতে হাউসিং সমবায় সমিতির পরিকল্পনা ও এ সংক্রান্ত প্রারম্ভিক নীতি-নির্ধারণেও ছিল তাঁরই ভূমিকা। শুরু থেকেই মেয়েদের ক্ষমতায়নের ওপর তাঁর নজর থাকায় আমূল থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের সমবায় প্রকল্পগুলিতে গোড়া থেকেই মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল। ৫৭৬ বা তার আশপাশের সংখ্যার দেশীয় রাজাদের ভারতভুক্তি বহুচর্চিত। হায়দরাবাদ বা কাশ্মীরে সামরিক অভিযান যাদের জানার তাঁরা জানেন। কিন্তু ৮২ শতাংশ হিন্দুপ্রধান জুনাগড়ের নবাব (এখানকারই নবাবপুত্তুর ছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো) পাকিস্তানে ঢুকাতে মরিয়া হচ্ছিলেন। প্যাটেল জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রমাদ গুনেছিলেন, কারণ তখনকার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সোমনাথ মন্দির ছিল এই জুনাগড় স্টেটেরই অন্তর্গত।

বহু বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রয়োজনে চাপ দিয়ে জুনাগড়ের স্টেট ভারতভুক্ত করতে সফল হয়েছিলেন তিনি। না হলে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। বিষয়টা তাঁর চেয়ে কেউ বেশি বোঝেনি, বললেন ড. বোস। মন্দির গড়তে গিয়েও স্বাধীনতার পর আবার সেই বিশ্বনেতা হওয়ার স্বপ্নে মশগুল প্রধানমন্ত্রীর কাছে সতর্কবাণী পেলেন। ভারতের মতো নতুন nation state-এর পক্ষে এই ধর্ম ভিত্তিক মন্দির নির্মাণকে সারা বিশ্ব হিন্দু Revivalism বলে নিন্দা করবে। এ বিষয়ে ড. বোস বিদগ্ধ বিষয়-পণ্ডিত কে এম মুন্সীর উল্লেখ করে বলেন সোমনাথ হিন্দুর অতীত ও হিন্দুর বর্তমানের যুগপৎ প্রতিনিধিত্ব করে। এই মন্দির বার বার বিদেশি

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসের ভেতর নেহরুপন্থী সেকুলারবাদীর সংখ্যা কম ছিল না। তবু 'দেশ প্রধান ও প্রথম' এই নীতি থেকে প্যাটেল কখনও টলেননি। ড. বোস যথার্থই আচার্য কৃপালনীকে উদ্ধৃত করে বলেছেন— 'Man of decision man of action'।

আক্রমণকারী দ্বারা ধ্বংস হয়ে হিন্দুর যৌথ অবচেতনায় হীনমন্যতা সৃষ্টি করে রেখেছে (collective unconscious)। সেই অদম্য আত্মসচেতন সেকুলারবাদীকে তিনি তাঁর যাবতীয় অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করেই মেনে নিতে বাধ্য করেন যে মন্দির নিয়তিনির্দিষ্ট।

একে বিলেতফেরত ব্যারিস্টার তার ওপর বাড়তি পণ্ডিত (সেটা যে কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার দৌলতে সেটাও খুব প্রচারিত হয়নি) উপাধিধারীকে সমঝাতে তো নিজেরও কিছু সিন্দুকে থাকা দরকার। হ্যাঁ, সরদার প্যাটেলও পরাধীন ভারতে ওকালতি পাশ করার পর বেশ কয়েকবছর আনন্দ জেলার বরসাদ শহরে প্র্যাকটিস করেন। পসার জমিয়ে ৩৬ বছর বয়সে তিনি বিলেতের প্রখ্যাত middle temple থেকে পুরোদস্তুর ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেন। এখানে তো তাঁর পসার ছিলই তবু তিনি দেশসেবাকেই বেছে নেন। এমন নয় যে আই এন এ বন্দিদের বিচারের সময় কোনো পণ্ডিতের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা না রাখতে পেরে ভুলাভাই দেশাই তাঁকে সরিয়ে নিজেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষে দাঁড়ান ও ঐতিহাসিক সওয়ালের পর মামলা জেতেন। এটি অন্য প্রসঙ্গ হলেও প্যাটেলের ব্যবহারিক জীবনের সাফল্য ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় হিসেবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনকেও যে প্রভাবিত করেছিল তারই প্রমাণ। এই ওকালতি সংক্রান্ত একটি চমকপ্রদ ঘটনাসূত্রে অধ্যাপক বোস বলেন একটি মামলার সওয়াল চলাকালীন তাঁকে খবর দেওয়া হয় যে তাঁর স্ত্রী সদ্য মারা গেছেন। প্যাটেল মামলা শেষ করে মক্কেলের কোনো ক্ষতি না হতে দিয়ে বাড়ি ফেরেন। এই একটি ঘটনাই কর্তব্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও চারিত্রিক ঋজুতা বোঝাতে 'মিথ' সমকক্ষ হওয়ার ক্ষমতাধারী হতে পারত। কিন্তু প্রায় অনুল্লেখিত অপরিজ্ঞাতই রয়ে গেল। সোমনাথ মন্দির নির্মাণের সাফল্যে হিন্দু ভারতে পরিচয় প্রতিষ্ঠায় সেকুলারি আক্রমণ তিনিই প্রথম প্রতিহত করেন। সেটিও তাঁর বিস্মৃতির আবর্তে যাওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

কোঅপারেটিভ, গৃহসমস্যা নিরসনের সঙ্গে ইংরেজের তৈরি আইসিএস-এর ধাঁচা ভেঙে দেশোপযোগী যে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনায় আই এ এস প্রথা চালু হলো তাঁরও সূচনাকারী ছিলেন প্যাটেল। আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ছিল। সেই সুবাদে ভারতীয় প্রশাসনিক চাকরির প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁরই হাত দিয়ে বেরিয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসের ভেতর নেহরুপন্থী সেকুলারবাদীর সংখ্যা কম ছিল না। তবু 'দেশ প্রধান ও প্রথম' এই নীতি থেকে প্যাটেল কখনও টলেননি। ড. বোস যথার্থই আচার্য কৃপালনীকে উদ্ধৃত করে বলেছেন— 'Man of decision man of action'। দেশে কারোর কারোর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও প্যাটেলকে তেমন দেখা যায় না। তাই লিঙ্কন মেমোরিয়ালের মতো Statue of Unity তৈরির মাধ্যমে তাঁকে বহু দিনের প্রাপ্য সম্মানই জাতি অর্পণ করেছে। দিনটি 'একতা দিবস' বলে ঘোষিত হয়েছে। এগুলি সবই তাঁর জীবনচর্যায় অর্জিত। তাই সরকারের তরফে এটি প্রত্যার্পণ বই কিছু নয়। ■

বিচলিত প্রজ্ঞাবানের চিন্তার পৃথুলতা

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি দ্য নিউইয়র্কারে প্রকাশিত (৬ অক্টোবর '১৯) এক সাক্ষাৎকারে অর্থনীতির খ্যাতকীর্তি অধ্যাপক নোবেলজয়ী অর্মত্যকুমার সেন নিজেকে কায়া ও মনের স্বাতন্ত্র্যের সজীব প্রতিমূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। অতীতেও এই স্বাতন্ত্র্যের কথা এমনভাবে না বললেও একাধিক সাক্ষাৎকারে, বক্তৃতায় এবং লেখায় অধ্যাপক সেন অকপটে এমন অনেক মন্তব্য করেছেন যেখানে এই উপলব্ধি স্পষ্ট। ১৯৯৮ সালে নোবেল স্মারক পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর কলকাতায় তাজ বেঙ্গলে নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটি নিউজ আয়োজিত পরিবেশ সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় তিনি পরিবেশ চর্চায় অর্থনীতির বিলম্বে অংশ নেওয়ার কেবল সমালোচনাই করেননি, পরিবেশ চর্চায় নিজের সীমিত অংশগ্রহণজনিত এক অপরাধবোধ ব্যক্ত করেছিলেন। নিউজ পরবর্তীকালে সেই ভাষণ প্রকাশ করতে চাইলে তিনি অনুমতি দেননি। একই ভাবে অর্থনীতিবিদদের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার বিষয়টিও তিনি লিখতে দ্বিধা করেননি। এমনকী সমাজ ও বহু সামাজিক সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে তাত্ত্বিক অর্থবেত্তাদের চেয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কালজয়ী সাহিত্যিকরা যে অনেক ক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে থাকেন সে কথাও বলেছেন নির্দ্বিধায়।

হার্ভার্ড স্কোয়ার সংলগ্ন এক জনবিরল সরণীতে স্ত্রী এমা রথসচাইল্ডের সঙ্গে অধ্যাপক সেন বর্তমানে বাস করেন। সেখানে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর পিতার অধ্যাপনার কথা, পণ্ডিত দাদামশাইয়ের লেখা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রথম বই প্রকাশের কথা যেমন বলেছেন, তেমনই কলেজ স্ট্রিটে কলেজ জীবনে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও স্ট্যালিনের হাতে বুখারিনের নিগ্রহ ও মৃত্যুর পর সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরম্পরায় অবস্থান না করে অ্যাডাম স্মিথ ও জন স্টুয়ার্ড মিলের ভক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। পর্যাপ্ত মনোযোগের সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত অধ্যয়নের কথাও নিজের মুখে বলেছেন।

গুরু-শিষ্য পরম্পরার ভাষায় মরিস ডবের কাছে নাড়া বাঁধার ফলে মাইহার ঘরানার মতো তাঁর বামপন্থী ঘরানার কথাও অর্থনীতির ছাত্র মাত্রই লক্ষ্য করে থাকবে।

সমস্যাটা হয়েছে যখন ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। অধ্যাপক সেনকে আমরা তখনই নিজহাতে নিজের রাজকীয় প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্যর প্রতি অবিচার করতে দেখেছি। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রসঙ্গে পাড়ার চায়ের দোকানের সর্বজ্ঞ দাদার ভাষায় তিনি যুক্তির জাল বিছিয়েছেন অ-অর্মত্যয়ী ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা নাকি বর্তমান ভারত সরকারের সমালোচনা টেলিফোনে তাঁকে করতে না চেয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে বলতে চাইছেন পাছে টেলিফোন ট্যাপ করা হয়! মোদী সরকার নাকি তাঁর ভাষায় 'বিশ্বের প্রাচীনতম' নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় না বানিয়ে ক্রমশ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বানাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার সৌজন্য গ্রহণের অক্ষমতা বর্তমান সরকার জানাতে গিয়ে তাঁর সুনাম রক্ষার্থে কারণগুলি প্রকাশ্যে আনেনি এটা সর্বজনবিদিত।

খাদ্যাভ্যাসজনিত প্রশ্নে বিশেষ করে বেদের যুগে ভারতবাসীর গোমাংস ভক্ষণের সঙ্গে হিন্দুদের গোভক্ষণকে এক করে দেখেছেন অধ্যাপক সেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী মানুষটির প্রতি অধ্যাপক সেনের বিরাগ সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার পক্ষে যুক্তি পরিশীলিত তত্ত্বের মোড়কে

হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। ২০১৪-র নির্বাচনের সময় থেকেই তিনি প্রবল মোদী বিরোধী অবস্থান ব্যক্ত করেছেন এবং মে মাসের গরমেও কোট পরে তাঁর বিপক্ষে ভোট দিতে এসেছেন। তখনও নোট বাতিল বা জি.এস.টি. লাগু হয়নি। ২০১৯-এর নির্বাচনে দ্বিতীয়বার বেশি মাত্রায় জনাদেশ নিয়ে মোদীর ক্ষমতায় আসার ঘটনায় তাঁর বিচলিত হওয়া বেশি চোখে পড়ছে। সরকারি নীতিসমূহের সমালোচনা বিদগ্ধ মহলে হতেই পারে এবং গণতন্ত্রে সেটা কাম্য। অধ্যাপক সেন আলোচ্য সাক্ষাৎকারে তা করেছেন।

তাঁর মতে মোদীর বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই জয় প্রকৃত অর্থে জয় নয়। আসল গণতান্ত্রিক জনাদেশ তাতে প্রতিফলিত হয়নি। ব্রাহ্মণ, বর্ণহিন্দু, দলিত, তপশিলি জনজাতি, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাত এবং ভোট শতাংশের ক্লিশে যুক্তির সাহায্যে তিনি এই জনাদেশের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে শাসকদল, স্বাধীন প্রেস, স্বাধীন দূরদর্শনের অনুপস্থিতি ও অফুরন্ত অর্থ-সহ বিজ্ঞাপনের জন্য এই সাফল্য পেয়েছে। তিনি মনে করেন ২০১৯-এর সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পুলওয়ামার ঘটনা। এই দেশাত্মবোধের বিষয়টা তাঁর মতে থ্যাচারের ফকল্যান্ড যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। থ্যাচার যেমন ফকল্যান্ড সংকটের আগের নির্বাচনগুলোতে হেরেছিলেন মোদীও পুলওয়ামার আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে হেরেছিলেন। এমনকী গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত হয়েও তিনি কোর্টকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পেরেছেন তিনি নির্দোষ।

তিনি বলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ভারতের বহুত্ববাদ ও সর্বধর্মসমন্বয় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, কারণ শৈশব থেকেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারে প্রভাবিত। অবশ্য একই সঙ্গে অর্মত্যবাবু বলেছেন As a political leader he is dynmic and enormously successful। এই অভিধা Academician হিসাবে তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও খাটে। শান্তিনিকেতনে যাঁর পুষ্টি, প্রেসিডেন্সিতে শ্রীবৃদ্ধি এবং পরবর্তীকালে যাদবপুর, কেমব্রিজ, দিল্লি, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স, অক্সফোর্ড, অবশেষে হার্ভাডে বিচরণ— তাঁকে Dynamic না বললে শব্দটাই মিথ্যে হবে। সেই সঙ্গে তাঁর সাফল্যের পালকতো গুণে শেষ করা কঠিন।

এহেন মানুষটি বলে বসলেন Gandhi was shot by an RSS member এবং তথাপি তিনি ভীত ছিলেন না এতদিন, কারণ আর এস এস এতদিন প্রান্তিক শক্তি ছিল। কিন্তু আজ তা আর নেই। তাই তিনি ভীত। এমনকী ভারতের শীর্ষ ন্যায়ালয়কেও তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেছেন এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতে বহুত্ববাদের ততটা অভিভাবক হতে পারছে না।

নেলীর মতো গণহত্যার ঘটনাকে কোনো ভাবেই উল্লেখ না করে গোধরা-উত্তর ঘটনার জন্য তিনি একা মোদীকে দায়ী করলেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি এক হেঁয়ালি মেশানো বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এতদিন ওই রাজ্যকে India occupied state হিসেবে রাখা হয়েছিল, Indian State বানানো হয়নি। আবার পরক্ষণেই বললেন ভারতের অংশ হওয়ার যে বিধান কাশ্মীরের ছিল কেন তা চালিয়ে যাওয়া হবে না তার কোনো কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে অকালপ্রয়াত অর্থনীতির অধ্যাপক কল্যাণ সান্যালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বিব্রত করতে পারে এমন প্রশ্নকে মনোহারিণী বাক্যজালের আড়ালে এড়িয়ে যাওয়ার ঈর্ষণীয় ক্ষমতার অধিকারী তিনি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে এত কম ভাবনাচিন্তার প্রকাশ কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান দারিদ্র্য বৈষম্য প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় তাঁর অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছে।

সাক্ষাৎকারের মধ্যে অনুরঞ্জনের ভূমিকাটা শক্তিশালী না হলে তা সাক্ষাৎকার থাকে না। বিতর্কের আসর হয়। এক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অবকাশ থেকে গেছে। অধ্যাপক সেন বোধ হয় সবচেয়ে নিজেকে বিতর্কিত রেখেছেন গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের প্রশ্নে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থানকে অনেকটাই উপরে রাখার প্রয়াসের মধ্যে।

Multiple Identity-র প্রশ্নে জোরের সঙ্গে তিনি বলেছেন এ বিষয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে। এক্ষেত্রে ভারতে নাকি এটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

আমরা জানি বাংলাদেশের জন্মের সময় চারটি প্রধান নীতি ছিল : গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলা জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২-তে ইডেন কলেজে এবং ১৯৭০-এ ডামি রাইফেল হাতে মহিলাদের মিছিলে বোরখা ছিল না। আজ শ্রমিক মহিলা থেকে সুপার এলিট পরিবারের মহিলাকেও হিজাব বোরখায় ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ অধ্যাপক সেন বলেছেন মহিলারা সেখানে ভারতের চেয়ে বেশি আলোকপ্রাপ্ত।

ইউরোপে, জাপানে, চীনে এমনকী ভারতেও কোনো ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে বেতার দূরদর্শন শুরু হয় না, বাংলাদেশে হয়।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেও এরশাদ যা করেনি সেটাই করলেন হাসিনা। ধর্মান্ধ শক্তি খিলাফতে মজলিসের সঙ্গে চারদফা চুক্তি করলেন। এগুলি হলো—

১. হাইকোর্ট বলেছিল কোনো মোল্লা ফতোয়া দিতে পারবে না। সেটা ফের চালু করা। ২. মহম্মদকে নিয়ে কটূক্তি করলে চরম শাস্তির বিধান চালু করা। ৩. কউমি মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মর্যাদা দেওয়া। ৪. জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামি ভাবধারা চালু করা।

সর্বোপরি, যে মদিনা সনদ খোদ আরব দেশগুলি মানে না সেই সনদ অনুসারে আজ বাংলাদেশ চলতে চাইছে। এতকিছুর পরেও বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ দেখেছেন অধ্যাপক সেন।

তিনি যে প্রসঙ্গে কখনোই মুখ বা কলম খোলেন না সেই Demographic বাস্তবতা এই সাক্ষাৎকারেও স্থান পায়নি। Diabolically Cunning শব্দটি কোনওভাবেই তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে যে কোনো শিক্ষিত মানুষেরই কলম কাঁপবে। কিন্তু ভারতীয়রা তর্কপ্রিয় হবে এটাতো তিনি চেয়েছেন।

একটা গান তখনই সার্থক ভাবে শেষ হয় যদি শিল্পী ঠিক মতো সময়ে এসে থামতে পারেন। মাঝে মাঝে মনে হয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমর্ত্যকুমার সেনের ক্ষেত্রেও এই কথাটা প্রযোজ্য। ■

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব বিজ্ঞানকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে আসার সুযোগ করে দেয় : ডাঃ হর্ষ বর্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন বলেছেন, ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি করতে এবং দূরত্ব দূর করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে আসার এক উপযুক্ত মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মেগা সায়েন্স এক্সপোজিশনের উদ্বোধন করে ডাঃ হর্ষ বর্ধন বলেন, সমগ্র দেশের কাছে তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য কলকাতা একটি গর্বের শহর। এই শহরের সঙ্গে ড. সি ভি রমন, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, ড. মেঘনাদ সাহা এবং ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এ ধরনের সেমিনার তথা প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলির নির্দেশকদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, অতীতের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা ও অর্জিত সাফল্যের মধ্য দিয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হলো বর্তমান প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যাতে বিজ্ঞানের উপকারিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন করে তোলা যায়। ডাঃ হর্ষ বর্ধন জোর দিয়ে বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলিকে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে, পড়ুয়াদের আরও কাছে নিয়ে আসতে পারলে দৈনন্দিন জীবনের মান আরও বাড়বে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়ুয়াদের গবেষণার মানসিকতা গড়ে তুলতে ও উৎসাহিত করতে পারলে দেশের অগ্রগতিতে এক ব্যাপক জ্ঞান-ভিত্তির সুযোগ তৈরি হবে। তিনি আরও বলেন, এই প্রথমবার পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ডাঃ হর্ষ বর্ধন বলেন, ভারত সুযোগ-সুবিধার এমন এক দেশ যেখানে উচ্চশিক্ষা তথা গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই বিজ্ঞান উৎসবে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, এঁদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবে। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞানমূলক অগ্রগতির ধারণা প্রোথিত করতে পারলে তা দেশের অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রণী তিনটি দেশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

দেশে দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে জানিয়ে ডাঃ হর্ষ বর্ধন বলেন, দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আবেগ ও উৎসাহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই উৎসব এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তিনি সমগ্র বিজ্ঞানী মহলকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন এমন এক বাতাবরণ গড়ে তোলার আহ্বান জানান যাতে শিশুদের বিজ্ঞানের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তোলা যায়। ড. হর্ষ বর্ধন বলেন, এই উৎসবে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানীদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহই দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি অগ্রাধিকারের কথা প্রতিফলিত করে।

ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলপথে পণ্য পরিবহণের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরই অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটের মাধ্যমে হলদিয়া থেকে গুয়াহাটির পাণ্ডু পর্যন্ত পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের সূচনা হলো। কলকাতার তারাতলায় কেন্দ্রীয় জাহাজ চলাচল মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট অব লাইট হাউস অ্যান্ড লাইট শিপসের কার্যালয় দ্বীপ ভবন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে এর সূচনা করেন জাহাজ চলাচল মন্ত্রকের সচিব গোপাল কৃষ্ণ। এই যাত্রাপথের সূচনার ফলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের নতুন দিক খুলে গেল। গঙ্গার ওপর নির্মিত এক নম্বর জাতীয় জলপথ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মিত দ্বিতীয় জলপথের মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করবে। 'এমভি মাহেশ্বরী' পণ্যবাহী জাহাজের মাধ্যমে এই জলপথে ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে হলদিয়া বন্দর থেকে অসমের গুয়াহাটির পাণ্ডু পর্যন্ত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে যাবে।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

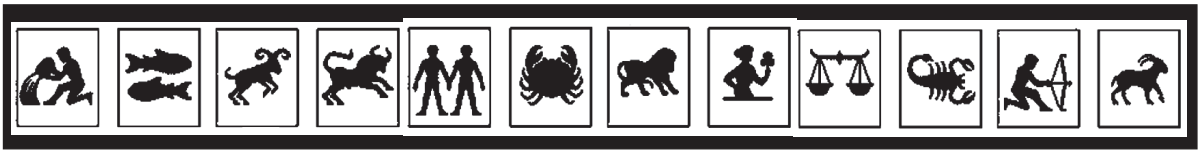

১১ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ১৭ নভেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, তুলায় রবি, মঙ্গল, বক্রী বুধ, বৃশ্চিকে শুক্র, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে মিথুনে পুনর্বসু নক্ষত্রে।

মেষ : কারিগরি কুশলতার বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতায় বিশিষ্টজনের সহায়তা ও অতিরিক্ত দায়িত্ব বৃদ্ধি। প্রিয়জনের শুভ সংবাদ ও বেকারত্বের অবসানে সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের সূচনা। বিবাদ-বিতর্ক ও ব্যবসায়ীদের ঋণ বৃদ্ধি। বাহন ও ভ্রমণ যোগ। শিল্পী, কলাকুশলীদের অনুষ্ঠানে ব্যস্ততা, যশ, খ্যাতি ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

বৃষ : প্রতিভার স্ফুরণ, সাধনায় দীপ্তি, চিন্তা, চেতনার বাস্তবায়ন। সন্তান-সন্ততির আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি, চৌম্বকীয় বাচনভঙ্গি ও তাৎক্ষণিক সদর্থক পদক্ষেপে ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও ধনলক্ষ্মীর ধনবর্ষণ। শিল্পী-সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, সঞ্চালক, বিউটিশিয়ান ও দূরদর্শন খ্যাতিদের সফল মনস্কাম। সপ্তাহের শেষভাগে জীবিকার্জনে অনিশ্চয়তা ও হতাশার মহাসমুদ্রে অবগাহন।

মিথুন : নিজ কর্মদক্ষতা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা। পারিবারিক পরিবেশ ও স্বজন সম্পর্কে উন্নতি। ভ্রাতা-ভগ্নীর উচ্চশিক্ষায় অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ ও প্রতিষ্ঠা। খনিজ তরল পদার্থ ও আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণতা পাবে। গৃহিণীর বৈষয়িক সমৃদ্ধির সহায়তা তবে রমণীর প্রতি দুর্বলতায় চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় বদনাম।

কর্কট : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতায় জগতের আনন্দযজ্ঞে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শংসা, সৃজনশীলতার উন্মেষ, সমান প্রগতিমূলক কর্মে স্বচ্ছন্দ পদচারণা ও সাবলীলতা বজায় থাকলেও ছিদ্রান্বেষীরা ছায়াসঙ্গী থাকবে। পিতৃ বিত্ত ও সম্পত্তি লাভ। বাহন ও তীর্থ ভ্রমণের যোগ। সন্তান সম্ভাবনার নেতিবাচক ফল।

সিংহ : নিকটজনের মন্দ ব্যবহার ও পারিবারিক অসুস্থতায় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হবে। কর্মক্ষেত্রে জমে থাকা কাজের পরিপূর্ণতা, আধিপত্য বৃদ্ধি, সন্তানের গবেষণামূলক কর্মে সাফল্য, প্রতিষ্ঠা, সৎকীর্তি, যশ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য গৌরবে নতুন আঙ্গিকে পথ চলা।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিবেশকে মানিয়ে চলতে হবে। ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মধ্যে দক্ষ নাবিকের ভূমিকায় চলতে হবে। বিদ্যার্থীদের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় সাফল্যের মাপকাঠি। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অপ্রত্যাশিত ব্যয় তবে স্ত্রীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি।

তুলা : জেদ, আবেগ পরিহার করে পারিবারিক ও কর্মস্থানে সমা ব্যবহারে উৎসাহিত করুন। গৃহিণীর শারীরিক অসুস্থতা ও সন্তানের চঞ্চল মানসিকতা, ফেসবুকে আসক্তি পবিত্র মানসিকতাকে কলুষিত করবে। বিদ্যার্থীর সাফল্য লাভে পরিশ্রম ও সংবেদনশীলতা দরকার। মাতার স্বাস্থ্যজনিত অযাচিত ব্যয়। সংক্রামক রোগে সতর্ক থাকুন।

বৃশ্চিক : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও স্বজন সম্পর্কে অন্তোষ, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অসহযোগিতায় জটিলতা। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় কর্মে জনপ্রিয়তা, লোকসন্তুষ্টি ও শিল্পী, কলাকুলীদের প্রতিভার বহুমুখী প্রয়াস, সৌভাগ্যের নতুন দিশা। মিত্রস্থান হিতকারী নহে।

ধনু : জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদ্ভাবনী শক্তি, মননশীলতা, সহানুভূতি, সমবেদনায় মানবিক গুণের প্রকাশ। সম্পত্তি সংস্কারে ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রতিবেশীর সঙ্গে বিতর্ক-বিবাদ এড়িয়ে চলুন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুজনের পরামর্শকে গুরুত্ব দিন। আয়ের মন্থর গতি ও ব্যয়বাহুল্যে সঞ্চয়ে হাত।

মকর : পরিশ্রম অনুযায়ী প্রাপ্তির স্বল্পতা। ভাবাবেগে বিশেষ সুযোগ হাতাছাড়া প্রতিবেশী ও স্বজন সম্পর্কে অবনতি, অস্থির চিত্ত। ফাটকায় ক্ষতি, অবঞ্চিত ব্যয়, বাতজ বেদনা ও শরীরের মধ্যভাগের চিকিৎসার প্রয়োজন। স্বনিযুক্ত প্রকল্পে নব উদ্যোগে সাফল্য। কর্মের যোগসূত্রে রমণী সান্নিধ্য, অভিমান, নৈরাশ্য।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে জটিলতার অবসান, আধিপত্য, দায়িত্ব বৃদ্ধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তি, বিদ্বান, পুত্রবান, শৈখিন ব্যবসায় উন্নতি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে উদার হৃদয়ের প্রকাশ। যশ, খ্যাতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। আর্থিক প্রাবল্য থাকলেও মহিলার দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে হঠাৎ অসুস্থতা।

মীন : সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতা, অধস্তনের ষড়যন্ত্র, রাজরোষ, হঠকারী সিদ্ধান্তে সতর্কতা। বন্ধু বিচ্ছেদ, অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক পরিহার শ্রেয়। জনসংযোগ, শিক্ষা অথবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। মস্তক ও বক্ষপীড়ায় ক্লেশ।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য